চার্বাক

তারকেশ্বর ডিগ্রী কলেজের বার্ষিক পত্রিকা

২০২৩ - ২০২৪

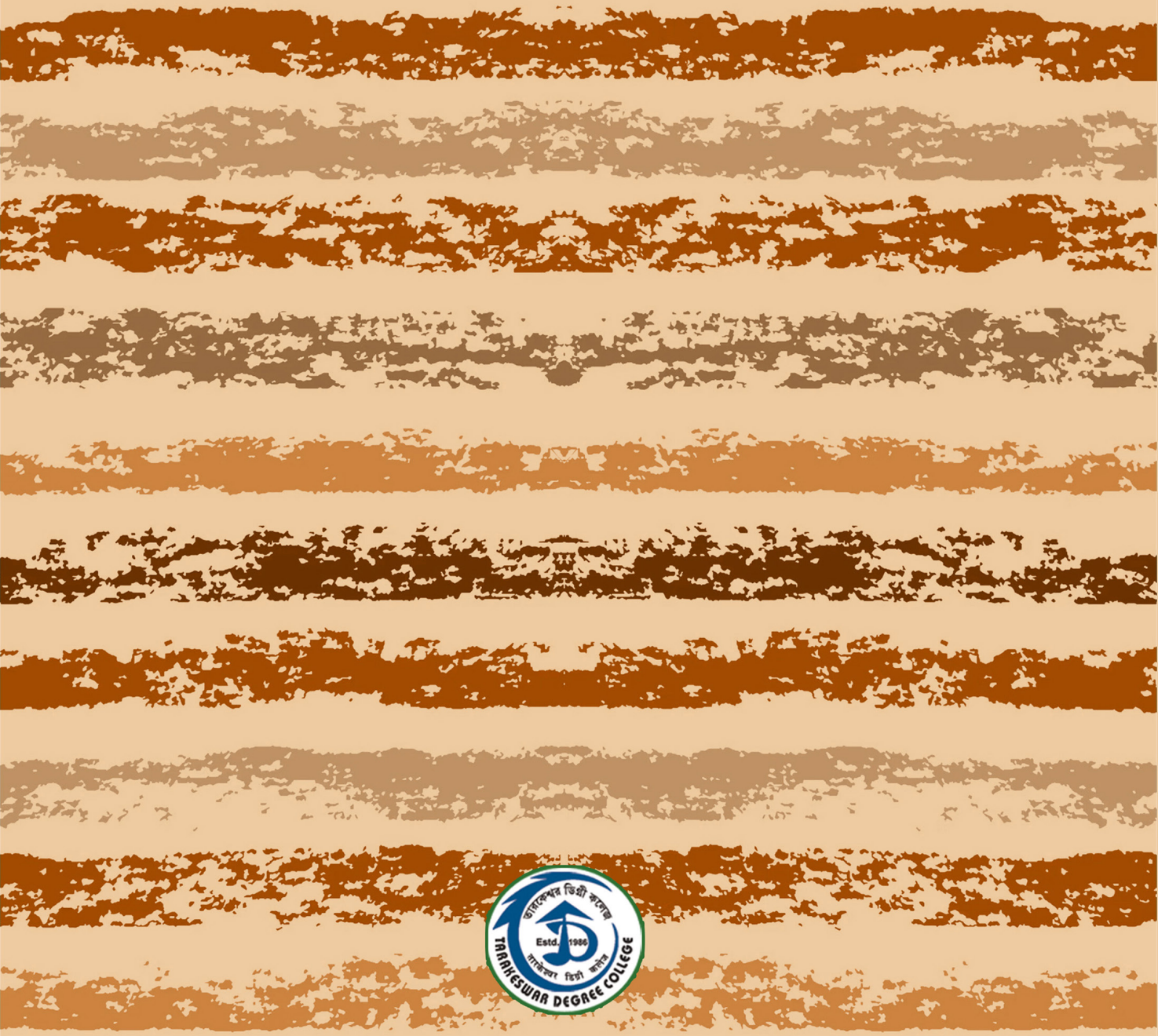

ছবি: (১) মাননীয় অধ্যক্ষ অমলকান্তি হাতি মহাশয়ের কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ।
(২) টিচার্স রুম। (৩) নারী দিবসে সেমিনার। (৪) কলেজের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

চার্বাক

(তারকেশ্বর ডিগ্রী কলেজের বার্ষিক পত্রিকা)

২০২৩ - ২০২৪

তারকেশ্বর ডিগ্রী কলেজ

স্থাপিতঃ ১৯৮৬

তারকেশ্বর * হুগলি

২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষের পত্রিকা পরিচালন কমিটির

সভাপতি

ড. অরুন্ধতী মৌলিক (রায়)

সহ-সভাপতি

ড. মহুয়া বিশ্বাস

সম্পাদক

ড. হিমাদ্রি মণ্ডল

কলেজ পত্রিকা কমিটির সদস্যবৃন্দ

ড. অর্পণ মান্না, ড. চন্দ্রমল্লিকা বিশ্বাস, ড. মানিক মণ্ডল, জারজিস হোসেন
ড. শাহিদুজ্জামান খান, ড. আশিসকুমার পাল, ড. পিঙ্গলা রায় চৌধুরী
সুনিতা সাহা, স্মৃতা মুখার্জি, ড. সৌমেন মুখার্জি, ড. সৌরভ ঘোষ

ছাত্র প্রতিনিধি

সমরেশ নস্কর, আকাশ বাউরি, শিবম ভৌমিক, অঙ্কিতা সামন্ত

প্রচ্ছদ

শুভঙ্কর মাজি

মুদ্রণ সহায়তা

আখরকথা

দেউলগ্রাম, বাগনান, হাওড়া - ৭১১৩০৩
কথা: ৮৫৩৬৮১১৮৯৮

কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতির শুভেচ্ছা-বার্তা

RAMENDU SINHARAY
Member,
West Bengal Legislative Assembly

RAMENDU SINHA RAY
Office Address
Vill-Dakshin Kotalpur
Kumrul Hooghly

Vill. : Dakshin Kotalpur
P.O. : Kumrul
P.S. : Dhaniakhali
Dist. : Hooghly
Pin. : 712410
M. : 9475163411
9933465181
e-mail : ramendusingharay@gmail.com

Date 07/12/2024

শুভেচ্ছা বার্তা

২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে তারকেশ্বর ডিগ্রী কলেজের বার্ষিক পত্রিকা 'চার্বাক' প্রকাশ পাচ্ছে এটি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। এই পত্রিকা শুধুমাত্র কিছু সাধারণ রচনার সম্ভার না হয়ে চিন্তনশীল মনের প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হবে এই প্রত্যাশা রাখি। যারা বিভিন্ন লেখালেখির মাধ্যমে এই পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের প্রত্যেককে আমার তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন। এই পত্রিকা আগামী দিনে সকলকে আরো বেশি সৃজনশীল লেখার, সু-চিন্তার অনুপ্রেরণা দেবে এই আশা রাখি।

একটি পত্রিকা তখনই সাফল্য পায়, যখন তা সকলের কাছে মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। এ বছরের পত্রিকা সেই প্রত্যাশা নিশ্চয়ই পূরণ করবে।

সকলে ভালো থাকবেন। আগত ইংরেজি নববর্ষের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাই সকলকে।

ধন্যবাদান্তে-

শ্রী রামেন্দু সিংহরায়

বিধায়ক, তারকেশ্বর বিধানসভা

RAMENDU SINHARAY
Member
West Bengal Legislative Assembly

কলেজের এন.সি.সি গ্রুপ

অ্যান্টি র‍্যাগিং বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি

ভূ মি কা

(ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষর অভিমত)

'চার্বাক' আমাদের তারকেশ্বর ডিগ্রী কলেজের নিজস্ব পত্রিকা। কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অশিক্ষক কর্মচারী সকলের নিজেদের পত্রিকা এটি। করোনা অতিমারির কারণে কিছুকাল এই বার্ষিক পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ করা যায়নি। নতুন উদ্যমে আবার যাত্রা শুরু করেছে সে।

অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিকই লেখালেখি শুরু করেছিলেন তাঁদের স্কুল বা কলেজের পত্রিকায়। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা যারা লেখালেখিতে উৎসাহী তাদের কাছে 'চার্বাক'-এ লেখা একটা ভালো সুযোগ। কলেজের বিভিন্ন বিভাগ থেকে সারা বছরই নানান দেয়াল পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সেসব দেয়াল পত্রিকা থেকে বাছাই করা ভালো ভালো লেখা 'চার্বাক'-এ প্রকাশ করা যেতে পারে, তাতে কলেজে সারা বছর ধরে লেখালেখির চর্চা আরও উৎসাহ পাবে।

এবারের 'চার্বাক'-এ যাঁরা লিখেছেন এবং এর প্রকাশের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের সকলকে আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। যাদের জন্য এই উদ্যোগ, সেই ছাত্র-ছাত্রীদের যদি এ পত্রিকা আকর্ষণ করতে পারে তাহলে সবার পরিশ্রম সার্থক হবে।

চরৈবেতি।

অরুন্ধতী মৌলিক (রায়)
প্রিন্সিপাল-ইন-চার্জ
তারকেশ্বর ডিগ্রী কলেজ

ডিসেম্বর ২০২৪

IQAC সমন্বকয়কের বার্তা

আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে তারকেশ্বর ডিগ্রী কলেজের বার্ষিক মুখপত্র 'চার্বাক'-এর নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নতির জন্য যেমন গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষাদান অপরিহার্য, তেমনি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশও অত্যন্ত জরুরি। আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান তারকেশ্বর ডিগ্রী কলেজ সর্বদাই এই দুটি দিকে সমান গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

'চার্বাক' পত্রিকা শুধুমাত্র একটি কলেজ ম্যাগাজিন নয়, এটি আমাদের শিক্ষার্থী, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও অশিক্ষক কর্মী বন্ধুদের সৃজনশীল চিন্তার একটি মিলনভূমি। এখানে প্রকাশিত প্রতিটি রচনা— তা সে কবিতাই হোক বা গল্প, ভ্রমণ কাহিনী বা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ— সবই লেখকদের গভীর অনুভূতি ও চিন্তন-মননের ফসল। বিশেষ করে আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীদের লেখায় যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটেছে, তা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য আশার আলো জ্বালিয়েছে।

আই.কিউ.এ.সি-র পক্ষ থেকে আমি পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী, সকল লেখক এবং যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই আমাদের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে, যাঁর নিরন্তর উৎসাহ ও সহযোগিতা ছাড়া এই প্রকাশনা সম্ভব হতো না।

আশাকরি, 'চার্বাক' আগামী দিনেও এভাবেই আমাদের তারকেশ্বর ডিগ্রী কলেজের পরিবারের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশে সহায়ক হবে এবং জ্ঞান ও সংস্কৃতির আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে। পত্রিকার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করছি।

শ্রী অর্পণ মান্না
(সমন্বয়ক)
IQAC
তারকেশ্বর ডিগ্রী কলেজ

স ম্পা দ কী য়

সৃজন ও ঊর্ধ্বায়ন অন্য প্রাণী থেকে মানুষকে শ্রেষ্ঠ করেছে। যাবতীয় বিষাদ, অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে মানুষই পারে সুখ ও আলোর সন্ধান করতে। অবকাশ, স্থিতি সৃজন আনে; কোলাহলের সে ক্ষমতা নেই। তবুও সৃষ্টিশীল মানুষ শত সামাজিক-পারিবারিক-ব্যক্তিক ব্যাধি, কোলাহল, ঝঞ্ঝার মাঝে শান্তি, অবকাশ খুঁজে নেয়; নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। নিজেকে ব্যক্ত করার এই সময় চুরিই তো সৃজনশীল মানুষের নিজস্ব সিগনেচার। প্রকাশে স্রষ্টা শুধু আনন্দ পায় না, ভোক্তাকেও আনন্দ দেয় এবং পাশাপাশি সমাজকে জানান দেয় আমি শুধু টিকে নেই বেঁচেও আছি, আরও ভালো করে বাঁচতে চাই।

তারকেশ্বর ডিগ্রী কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষা-সহায়ক কর্মচারীদের সৃজনশীল মনের সামান্য পরিচয় 'চার্বাক'-এর এই সংখ্যায় ধরা রইল। লেখার মানের উৎকর্ষ এখানে যতখানি বিচার্য, তার থেকে বেশি বিচার্য সকলের উৎসাহ উদ্দীপনা। নীরব কবি হয় না, প্রকাশই কবিত্বের মূল শর্ত। সংকোচ, লজ্জা, ভয়ের কোনো নুড়িই এই সংখ্যার লেখক-লেখিকাদের বাধা হয়নি। নিজেদের অন্তরকে অকপটে প্রকাশ যারা করতে পেরেছেন বা যারা করতে পারেননি অথচ পরবর্তীতে অগ্রজদের দেখে পারবেন এবং যারা লেখক বা লেখিকা হিসেবে নন- পাঠক হিসেবেও এই সংখ্যা পড়বেন তাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই।

পত্রিকা প্রকাশ বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, বার্শার, ম্যাগাজিন কমিটি ও আরও অনেকের আন্তরিক সহযোগিতা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করি। 'আখরকথা' প্রকাশনার কর্ণধার ছাত্র ও ভ্রাতৃ-প্রতিম শুভঙ্কর মাজি শুধু এই পত্রিকার প্রচ্ছদ ডিজাইন করেনি, পত্রিকার মান উন্নয়নের জন্য সর্বত চেষ্টা করেছে। তাকে জানাই স্নেহ ও ভালোবাসা। যাদের লেখাকে এই সংখ্যায় জায়গা দেওয়া গেলো না, জানি তারা এবং পত্রিকার ভুল-ত্রুটি যাদের চোখে পড়বে তারাও নিজ নিজ গুণে সম্পাদককে ক্ষমা করে দেবেন।

সকলের মঙ্গল হোক।

ডিসেম্বর, ২০২৪

ধন্যবাদান্তে
ড. হিমাদ্রি মণ্ডল
সম্পাদক, *চার্বাক*
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে ভূমিদাতা - মহাপ্রাণ শ্রীশ্রীমৎ দণ্ডিস্বামী হৃষিকেশ আশ্রম, মোহান্ত মহারাজ, তারকেশ্বর মঠ

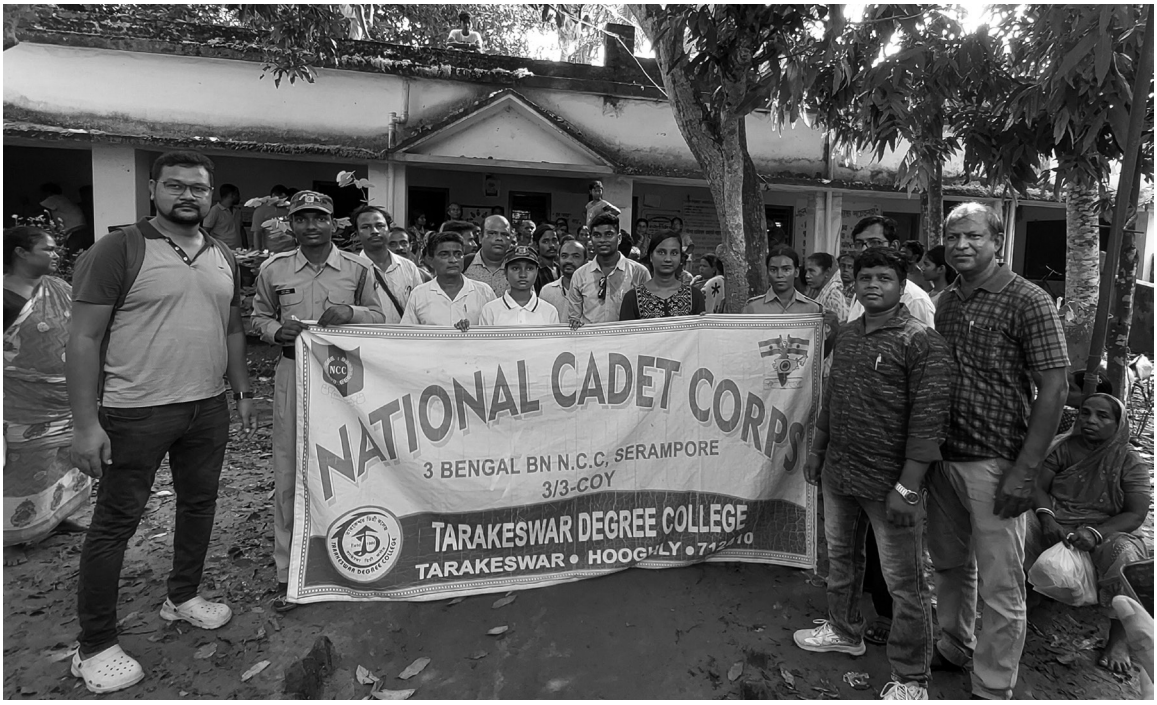

কলেজের পক্ষ থেকে বন্যাদুর্গতদের ত্রাণ সরবরাহ

সূচিপত্র

কবিতা

● মহীরুহ - দেবারতি চক্রবর্তী ১১

● ছেলেবেলা - অর্ঘ্য ভড় ১১

● ঋতুর শহর - মোহর ১২

● জীবন আলো - শুভেন্দু দে ১২

● ব্যস্ততা - পিঙ্গলা রায় চৌধুরী ১২

● দহন জ্বালা - রিতা সাঁতরা ১২

গল্প

● The Forgotten Cricket Bat - Shuvam Gupta ১৩

● ক্ষুদ্রতমের বিশ্ব: একটি কোয়ান্টাম কাহিনী - শ্রী অর্পণ মান্না ১৫

● চোরা স্রোত - সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭

প্রবন্ধ

● রহস্যময় গ্রন্থ - শুভদীপ ঘড়া ১৮

● SUBCONSCIOUS MIND - Priya Pal ২১

● স্বনির্ভর দল ও স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্ব-রোজগার যোজনা: একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা - শুভ্র সরকার ২৩

● রবীন্দ্রনাথের গানে সভ্যতার সংকট ও বিশ্বমানবতাবোধ - ড. মহুয়া বিশ্বাস ২৭

● বর্তমানের উন্নয়নের সংকট-মুক্তির উপায় হিসেবে রবীন্দ্র-ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা - ড. মানিক মণ্ডল ৩১

● What IT jobs are available now for college graduates? - Sandip Tigga ৩৪

● Human Values are the Pursuit of Happiness - Sunita Saha ৩৭

● I-DOC: Revolutionizing Healthcare with AI-Powered Disease Prediction - Sk Md Abidar Rahaman ৪০

● নীতি ও আইনের পাঠ: ছেলেবেলার কিছু ভালোলাগা বই - ড. হিমাদ্রি মণ্ডল ৪১

আমাদের কথা

● ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে আমাদের সাফল্যের কিছু খতিয়ান ৪৭

● ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ৪৭

● কলেজ পরিচালন কমিটির সদস্যদের তালিকা ৪৮

কলেজের পক্ষ থেকে বন্যাদুর্গতদের ত্রাণ দিতে যাওয়ার আগে কলেজের সামনে

মানুষ বড় কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও

মহীরুহ

দেবারতি চক্রবর্তী
পঞ্চম সেমেস্টার, বাংলা বিভাগ

সম্ভ্রান্ত এক পরিবার থেকে আজ বড়ই একা!
শ দুই পিছিয়ে দেখো পাবে তাদের দেখা।
ঠায় দাঁড়িয়ে যুগ যুগান্তর ছাড়িয়ে বয়সসীমা,
কত দিয়েছে, কত দেখেছে, ইতিহাস করেছে জমা!

পুকুর হতে আঁশটে গন্ধে সন্ধ্যে যখন নামে,
আলেয়ার মতো ডাঁয়ে জোনাকি শত ঝিঁঝিঁ বামে।
চাঁদের আলোয় পথের ধুলো মিলায় নরম লালচে শাখে,
কত না শৃগাল, হায়না দেখেছো সে ঝোপের বাঁকে।
কত না রমণী কলস কাঁখে নেমেছে ঝিলের তীরে....
শত কোলাহল, খিলখিল উচ্চ কণ্ঠ মেতেছে তীক্ষ্ণ স্বরে।
মাটির দেওয়ালে বৃষ্টির পর সোঁদা গন্ধ সে জানে...
শরতের শেষে কত যে শিশির ঝুরি বেয়ে তার নামে।
গ্রীষ্মে যেথায় ভরদুপুরে একটা ঘু ঘু ডাকে...
নিঝুম বনে দূর হতে তার প্রতিধ্বনি হাঁকে।
কত খরা কত যে বন্যা কত যে উর্বর জমি...
কয়েক মারীর তীব্র রোষের মাত্র জীবিত সাক্ষী তুমি।
বয়স দোষে জরাজীর্ণ আগলে রাখো বাকলগুলো, শৈশব খুঁজি হায়...
দূরের ওই হাইওয়ে, ফ্ল্যাটের আলো জোনাকি খুঁজি, লরি ট্রাকটায়।

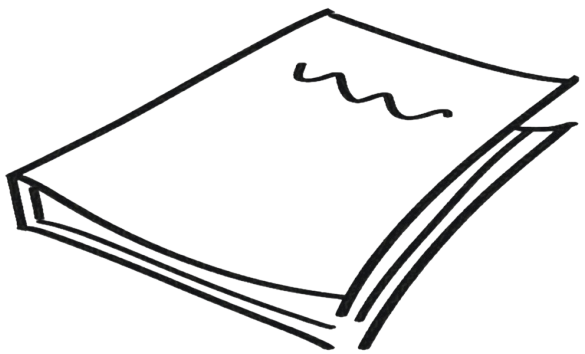

জীবন আলো

শুভেন্দু দে
পঞ্চম সেমেস্টার, কম্পিউটার সাইন্স ডিপার্টমেন্ট

জীবন স্মৃতির ঝাপসা আলোয়
পুরানো কথা ভেসে ওঠে।
স্মৃতিচারণ করা ভালো
যদি স্মৃতির মধ্যে ফুল ফোটে।

যখন স্মৃতি দুঃখ ভরা
তখন তারে মুছে ফেলা,
আর যখন স্মৃতি রবির আলো
তখন তারে জড়িয়ে ধরো।

স্মৃতিচারণ করা ভালো
যদি রবির আলো
প্রবেশ করে।
নইলে স্মৃতি মুছে ফেলে
যদি অন্ধকারে গ্রাস করে।

পুরানো ভুল করোনাকো আর
শিক্ষা নাও স্মৃতি থেকে
সদাই থেকো হাসিখুশি
আর এগিয়ে যাও আলো পথে।

ঋতুর শহর

মোহর
প্রাক্তনী, বাংলা বিভাগ

গ্রীষ্মবিকেল ধূসর রঙা, কল্লোলিনী আধসোহাগী,
অ্যাকাডেমির চত্বরে আজ তোমার আমার মনবিবাগী।
দিগন্ততে ডাক পাঠালাম, বর্ষাতি মন তোমায় খোঁজে,
নিয়ন আলোয় গল্প শুনে তিলোত্তমা দুচোখ বোজে।

শারদীয়ার ছোঁয়ায় যেন উথালপাতাল নগর জীবন,
উৎসবেরই তুফান তুলে বাউন্ডুলে ফেরারি মন।
ময়দানের ঐ গালচে সবুজ দখল করে কাব্য কত!
হেমন্তিকার শেষ শিশিরে তুমিও ভেজো আমার মত।

রিক্ত তুমি, জীর্ণ তুমি, তবুও তোমায় ভালবাসি;
যাদুঘরের এক পৃথিবী আলসে শীতেই ঘুরে আসি।
আবির মেখে বসন্তকে জড়িয়ে রেখো আলতো করে,
শহর তুমি আমারই থেকো, দুঃখে সুখে, স্বপ্ন-ঘোরে!

ছেলেবেলা

অর্ঘ্য ভড়
প্রথম সেমেস্টার, কম্পিউটার সাইন্স ডিপার্টমেন্ট

আর কি আমি ফিরে পাবো, সেই ছেলেবেলা?
পড়াশোনা করতাম ঠিকই, আর করতাম খেলা।
কত রঙিন স্বপ্ন ছিল, ছিল শখের কলরব,
ইচ্ছাগুলো পূর্ণ হতো, একের পর এক সব।
সময় যাচ্ছে জলের মতো, হয়ে যাচ্ছি বড়ো,
সখ আহ্লাদ সরিয়ে রেখে, দায়িত্ব পালন করো।
স্বপ্নগুলো সরিয়ে দিলাম, গুছিয়ে রাখলাম তাকে।
দায়িত্ব পালন করতে হবে, দেখতে হবে মাকে।
দায়িত্ব পালন করতে করতে, আর হয় না খেলা,
আর কি আমি ফিরে পাবো আমার ছেলেবেলা?

ব্যস্ততা

পিঙ্গলা রায় চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক, বাণিজ্যিক বিভাগ

ক্লান্ত শহর আর এলোমেলো ছড়িয়ে থাকা ব্যস্ত মানুষ।
বেহালার নিস্তরঙ্গ সুরের মতো সবাই ছুটছে....

আচ্ছা! ওই যে হাওড়া ব্রিজের মরচে ধরা পরিকাঠামো,
বা ওই গতিময় চার চাকার নীচে শোষিত, বৃহতাকার
উড়ালপুলের মুখচোরা রাস্তা, বা ওই স্কাই-ওয়াক-এর
উপরে চুপচাপ বসে থাকা একাকী কাক...
একে অপরের সাথে কথা বলে?

ওরা বৃষ্টি ভেজে, রোদে হাসে, শীতে কাঁদে...
অনেক রাত অবধি না চেয়েও জেগে থাকে,
কিন্তু কেউ কারোর মনের খোঁজ রাখে?

না না। ধুর! মন... তার আবার খোঁজ কেউ রাখে নাকি?
সবাই তো ব্যস্ত।

দহন জ্বালা

রিতা সাঁতরা
স্যাক্ট- ২ অধ্যাপক, শারীর শিক্ষা বিভাগ

সারা জীবন দুঃখ আমার
সুখ নাহি পাই
জ্বলে পুড়ে মরছি আমি
কোন পথে যাই।

চিতার আগুনে পুড়ছি আমি
চোখের জলে ভাসি
তবুও এ মনে বাঁচার সাধ
বল কোথায় রাখি।

The Forgotten Cricket Bat

Shuvam Gupta

First Semester, Computer Science Department

Shubh grew up in a small village called Iswarpur, where the summer air always carried the sound of cricket bats striking balls and children shouting in joy. For as long as he could remember, he had one dream: to become a cricketer.

Shubh's hero was Virat Kohli, a local boy who had made it big in professional cricket. Every time Virat was on TV, Shubh would sit cross-legged on the floor, imitating his batting stance and perfecting his imaginary cover drive. But Shubh didn't just dream; he played. Every morning before school and every evening after, he practiced in the dusty field behind his house, using a bat his father had bought for him. It wasn't perfect, but to Ravi, it was magical.

A Field of Dreams: In Iswarpur, cricket was just a sport—it was hope. Boys like Shubh saw cricket as their way out of the endless cycle of poverty. Shubh's father, a farmer, worked tirelessly to provide for the family, often coming home with aching limbs and sunburned skin. Despite his struggles, he supported Shubh's passion.

"Chase your dreams," his father would say. "But remember, they won't come easy."

Shubh moved, absorbing his father's words like they were holy book. He practiced harder, learning to bat against the uneven bounce of the field and honing his aim by bowling at a single stump.

The First Setback: One day, during a local cricket match, a talent scout from the district academy came to watch. Shubh played brilliantly, scoring fifty runs in just twenty balls and four wickets. After the game, the scout approached him. He got the Man Of The Match award.

"You've got real talent, boy," the man said, scribbling something on a piece of paper. "Come to the district trials next month."

Shubh could just contain his excitement. He ran home to tell his parents. But his joy was short-lived.

"How much will it cost?" his mother asked hesitantly.

"Travel, fees, a proper kit," his father muttered, calculating in his head. "At least five thousand rupees."

It was more than the family could afford. Shubh's father tried borrowing from neighbors, but no one had extra to spare. In the end, they had to tell Shubh he couldn't go. He moved quietly, but his heart cracked like an overused cricket ball.

Clinging to the Dream: Despite the setback, Shubh refused to give up. He continued playing, joining every local tournament he could. His

reputation grew, and he became the go-to player for any team needing a reliable batsman. But as the years passed, Shubh's responsibilities grew too.

At fifteen, he started helping his father in the fields. By seventeen, he had dropped out of school to work full-time. Cricket became an occasional joy, a game played on rare Sundays when work was light. Still, whenever he picked up a bat, Shubh felt the fire in his soul reignite.

The Final Match: At twenty-one, Shubh got one last chance to revive his dream. The district team was hosting open trials, and the entry fee had been reduced to a nominal amount. Shubh's friends pooled money to buy him a second-hand cricket kit, and his father gave him the little he could spare for travel.

"Go, Shubh," his father said, clapping him on the shoulder. "Show them what you're made of."

The trials were intense. Hundreds of young men competed for a handful of spots. Shubh batted well, his timing impeccable, his shots precise. When the final list of selected players was announced, his name was on it. For the first time in years, Shubh felt that his dream was within reach. But life, as it often does, had other plans.

A Hard Choice: After some days, a storm ravaged Iswarpur. The rain flooded their fields, destroying the crops that were the family's sole source of income. Shubh returned home to find his father sitting on the floor, his head in his hands.

"We've lost everything," his father whispered.

Shubh knew what this meant. Without the crops, they couldn't repay their loans. Without money, they couldn't survive. The district team required players to relocate and attend full-time training camps. It was an opportunity Shubh couldn't afford to take. He made his decision that night. The next morning, he went to the team's office and withdrew his name.

Letting Go: The years that followed were a blur of hard work and sacrifice. Shubh took up odd jobs in the city, sending money home to help his family rebuild. His cricket bat, once his prized possession, gathered dust in a corner of the house. Occasionally, when he visited Iswarpur, he'd see kids playing in the field.

An Unexpected Encounter: One evening, nearly a decade later, Shubh was walking home from his job as a delivery boy when he saw a group of boys playing cricket in an alley. Their bat was broken, held together with tape, and their ball was a bundle of cloth tied with string. Something stirred in Shubh as he watched them play with the same passion he once had.

"Hey," he called out. The boys stopped and looked at him warily. Shubh walked over and handed them the bat he had carried since childhood, the one he kept as a memory.

"Take this," he said. "Play like champions."

The boys shined with gratitude, their excitement catching. As they resumed their game, Shubh stood there for a moment, feeling an unexpected lightness. It wasn't the life he

had dreamed of, but in that moment, he felt he had passed on something far more important.

The Legacy of a Dream: Years later, one of those boys from the alley would go on to play for the state team. In interviews, he often spoke of a man who had given him his first real cricket bat and the belief that he could achieve greatness. Though Shubh's name was never mentioned, his dream lived on in the spirit of another.

And somewhere in a quiet village, a dusty field echoed with the laughter of children chasing their own dreams, dreams born from a forgotten cricket bat and a man who had never truly let go of his love for the game.

ক্ষুদ্রতমের বিশ্ব: একটি কোয়ান্টাম কাহিনী

শ্রী অর্পণ মান্না

সহকারী অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ

একটা অন্ধকার রাত। ঝিলিমিলি আলোয়, কলকাতার এক ছোট্ট ঘরে, অর্ণব নিজের পুরোনো লেপটপের পর্দায় তাকিয়ে আছে। সে একজন ভৌতবিজ্ঞানের ছাত্র, কোয়ান্টাম মেকানিক্স নিয়ে গভীরভাবে মুগ্ধ। সারাদিন সে শ্রোডিঙ্গারের বিড়াল, হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি, এইসব গাণিতিক জটিলতার সঙ্গে লড়াই করেছে। এখন রাত, আর সে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছে।

স্বপ্নে সে একটা অসাধারণ দুনিয়ায় পৌঁছেছে – একটা দুনিয়া যেখানে প্রতিটা কণা নাচছে, কখনও এখানে, কখনও ওখানে, নিয়মের বাইরে। সে দেখতে পাচ্ছে ইলেকট্রনগুলি অদ্ভুতভাবে কক্ষপথে ঘুরছে, কখনও একসাথে, কখনও আলাদা। এই অদ্ভুত নৃত্যের মাঝে, সে দেখতে পায় একজন বৃদ্ধ। বৃদ্ধটির চেহারা অস্পষ্ট, মনে হয় যেন একটা ধোঁয়ার মেঘের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

"তুমি কে?" অর্ণব জিজ্ঞাসা করে কণ্ঠে একটু ভয়ের ছাপ নিয়ে।

বৃদ্ধটি হাসে, একটা মৃদু, রহস্যময় হাসি। "আমি এই বিশ্বের রক্ষাকর্তা" বলে সে, "কোয়ান্টামের দুনিয়ার রহস্যের রক্ষাকর্তা। তুমি এখানে কোয়ান্টামের অদ্ভুত বাস্তবতা দেখতে এসেছ?" বৃদ্ধটি অর্ণবকে একটা ছোট্ট কাঁচের বাক্স দেখায়। বাক্সের ভেতর একটা ছোট্ট পিঁপড়ে আছে। কিন্তু এটা কোনো সাধারণ পিঁপড়ে নয়। এটি একসাথে দুই জায়গায় আছে! একটা পিঁপড়ে বাক্সের এক কোণে আছে, আর অন্যটা বাক্সের অপর কোণে। "এই হলো কোয়ান্টাম অবস্থা," বৃদ্ধটি ব্যাখ্যা করে। "একটা কণা একসাথে অনেক জায়গায় থাকতে পারে, যতক্ষণ না আমরা তাকে পর্যবেক্ষণ করি। পর্যবেক্ষণের ক্ষণে তার অবস্থা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। ঠিক যেমন তোমার এই পিঁপড়েটি এখন এক জায়গায় থাকবে যখন তুমি তাকে দেখবে।" অর্ণব একটু চমকে ওঠে। সে জানে শ্রোডিঙ্গারের বিড়ালের উপমা। কিন্তু এটা তার চোখের সামনে ঘটছে!

বৃদ্ধটি তাকে আরও দেখায় কোয়ান্টাম টানেলিং। একটা ইলেকট্রন একটা প্রাচীর পার হয়ে যাচ্ছে, যদিও তার এত শক্তি নেই প্রাচীর ভেঙে যাওয়ার জন্য। এটা একটা অসম্ভব ঘটনা শাস্ত্রীয় পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, কিন্তু কোয়ান্টাম দুনিয়ায় সাধারণ ঘটনা। "কোয়ান্টাম দুনিয়া অনিশ্চয়তার দুনিয়া," বৃদ্ধটি বলে। "আমরা কখনো নিশ্চিত হতে পারি না একটা কণার ঠিক কোথায় আছে বা কি গতি আছে।

হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি এটাই বলে।" অর্ণব প্রশ্ন করে, "তাহলে কি এই বিশ্ব পুরোপুরি অনিয়ন্ত্রিত?" বৃদ্ধটি হাসে। "না, এটা অনিয়ন্ত্রিত নয়। এর নিজস্ব নিয়ম আছে, যা আমরা ধীরে ধীরে বুঝতে পারছি। কোয়ান্টাম যান্ত্রিকী আমাদের এই নিয়মগুলি বুঝতে সাহায্য করে।"

বৃদ্ধটি অর্ণবকে দেখায় কীভাবে দুটি কণা একসাথে জড়িত থাকে, যদিও তারা দূর দূরে থাকে। একটা কণার অবস্থা পরিবর্তিত হলে, অন্য কণার অবস্থা ও পরিবর্তিত হয় তাৎক্ষণিকভাবে, যে ব্যাপারটিকে আমরা কোয়ান্টাম এনট্যাঙ্গলমেন্ট বলি। সে অর্ণবকে একটা কোয়ান্টাম কম্পিউটার দেখায়। একটা অসাধারণ যন্ত্র যা শাস্ত্রীয় কম্পিউটারের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাশালী। এই কম্পিউটার কোয়ান্টাম বিতরণ ব্যবহার করে গণনা করে।

স্বপ্নের শেষদিকে, বৃদ্ধটি অর্ণবকে বলে, "তোমার কাছে এখন কোয়ান্টামের বিশ্ব একটু স্পষ্ট হয়েছে আশাকরি। এই অদ্ভুত বিশ্ব আমাদের অনেক কিছু শিখিয়ে দিচ্ছে। এবং এর অন্বেষণ চালু রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

অর্ণব চোখ খুলে ওঠে। সে তার লেপটপের পর্দায় তাকায়। লেপটপটি এখনো চালু আছে, শ্রোডিঙ্গারের সমীকরণের গাণিতিক জটিলতা পর্দায় ঝিলিমিলি করে। স্বপ্নটা তাকে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের গভীরে নিয়ে গিয়েছে, তার জ্ঞানের দিগন্ত বিস্তৃত করেছে। সে জানে, এই অসাধারণ দুনিয়ার অন্বেষণ এখনো অনেক দূর বাকি। কিন্তু সে প্রস্তুত। সে জানে এই অদ্ভুত, রহস্যময় কোয়ান্টাম বিশ্ব এখন তার জন্য একটু কম রহস্যময়। তার অন্বেষণ চালু থাকবে। অর্ণবের স্বপ্নের প্রভাব তাকে একটা নতুন উত্সাহে পূর্ণ করে তুলেছিল। সে সারা দিন কোয়ান্টাম মেকানিক্সের গ্রন্থ পড়ে, গাণিতিক সমীকরণ সমাধান করে কাটায়। তার অধ্যাপক, ডঃ বসু, একজন প্রখ্যাত কোয়ান্টাম পদার্থবিদ, তার উৎসাহ দেখে প্রশংসা করে।

"আমি দেখছি তুমি এই বিষয়ে গভীর আগ্রহ নিয়েছ," ডঃ বসু বলেন এক দিন ক্লাসের পর। "কোয়ান্টাম মেকানিক্স একটা রহস্যময় বিষয়, কিন্তু এই রহস্যের মধ্যেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লুকিয়ে আছে।" ডঃ বসু অর্ণবকে তার গবেষণা দলে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেন। অর্ণব খুশিতে উত্তাল হয়ে ওঠে। সে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ পাবে, যেখানে তার স্বপ্নের কোয়ান্টাম মেকানিক্সের গভীরতা সম্পর্কে জ্ঞান কাজে লাগবে।

গবেষণা প্রকল্পটি ছিল কোয়ান্টাম কম্পিউটারের উন্নয়ন। অর্ণব এবং তার সতীর্থরা দিনরাত কাজ করে কোয়ান্টাম বিতরণ এবং কোয়ান্টাম এনট্যাঙ্গলমেন্টের উপর। তারা কোয়ান্টাম বিট, অর্থাৎ কিউবিট, নিয়ে কাজ করে, যা শূন্য এবং এক দুটো অবস্থার একসাথে থাকতে পারে। এক দিন, অর্ণব একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন করে। সে একটা নতুন অ্যালগরিদম বের করে, যা কোয়ান্টাম কম্পিউটারের গতি বাড়িয়ে দেয় অনেক গুণ। তার উদ্ভাবন সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের ধ্যান আকর্ষণ করে। তার নাম এখন 'বিজ্ঞানের জগতে সুপরিচিত।

কিন্তু অর্ণব জানে, কোয়ান্টাম মেকানিক্সের রহস্য এখনো অনেক দূর অব্যাখ্যাত থাকবে। এই অদ্ভুত বিশ্ব তার এখনো অনেক কিছু শিখাতে বাকি আছে। সে এর অন্বেষণ চালিয়ে যাবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। কারণ সে জানে, ক্ষুদ্রতমের এই বিশ্বের মধ্যেই লুকিয়ে আছে বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ রহস্য। এবং সে সেই রহস্য উন্মোচনের জন্য প্রস্তুত। তার স্বপ্ন, তার গবেষণা, তার জীবন – সবকিছু এই অনন্ত অন্বেষণেরই প্রতিফলন। এবং তার প্রতি এই অন্বেষণের প্রতি একটা অদম্য আগ্রহ তাকে চালিয়ে নিয়ে যাবে আগামী দিনগুলিতে।

> "Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning."
>
> —*Albert Einstein*

চোরা স্রোত

সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলেজ শিক্ষক, কম্পিউটার সাইন্স ডিপার্টমেন্ট

পরীক্ষা হলের নিস্তব্ধ পরিবেশে পরীক্ষকের দৃষ্টি পড়ল একটি মেয়ের দিকে। যেমন দুধে আলতা গায়ের রং লম্বা সুকেশী অসম্ভব সুন্দরী মুখে স্মৃত হাসি ও চোখের মধ্যে অদ্ভুত একটা আকর্ষণ। বয়স বিশের কোঠায়। কিন্তু তার মধ্যে একটা আলাদা ধরনের প্রভাব ছিল যা সহজেই চোখে পড়ে। মেয়েটি পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর থেকেই নিজের কাজে মগ্ন। মাথা নিচু করে নোটবুকের পাতায় কলমের নরম চলাচল। লেখার ভঙ্গি, প্রতিটি লাইনে গভীর মনোযোগ, যেন চারপাশের কেউ নেই।

পরীক্ষক হঠাৎ বুঝতে পারলেন তার ভেতরে এক অদ্ভুত আকর্ষণ কাজ করছে। মেয়েটি অন্য পরীক্ষার্থীদের মতো নয়। সে অন্যদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার কোনো প্রয়োজন বোধ করে না, কারো সঙ্গে ফিসফিসে কথাও বলে না। শুধু নিজের মধ্যে নিজেই।

পরীক্ষার সময় যত এগোতে লাগল, ততই মেয়েটির এই স্বাভাবিক অথচ গম্ভীর চাহনি, শান্ত লেখার ভঙ্গিমা, আর অন্যদের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা পরীক্ষকের মনোযোগ টেনে নিল। পরীক্ষক ভাবলেন, মেয়েটির মধ্যে এই নির্লিপ্ততা আর আত্মবিশ্বাস কোথা থেকে এল?

পরীক্ষা শেষ হলে সবাই ব্যস্তভাবে নিজের খাতা জমা দিয়ে বের হতে লাগল, কিন্তু সেই মেয়েটি শান্তভাবে নিজের খাতা জমা দিয়ে সোজা দরজার দিকে পা বাড়াল। একবারও পেছনে ফিরে তাকাল না, কারো সঙ্গে কোনো কথাও বলল না। যেন তার নিজস্ব একটি জগৎ রয়েছে, আর সে সেখানে সম্পূর্ণ তৃপ্ত।

পরীক্ষক বারবার ছুটে গেছেন যে রুমে মেয়েটি পরীক্ষা দিচ্ছিল, বারংবার দেখেছেন কিন্তু মেয়েটি যে সারিতে বসে পরীক্ষা দিচ্ছিল সেই সারিতে যাওয়ার সৎ সাহসটুকু পর্যন্ত পাননি প্রথমত মেয়েটির যাতে পরীক্ষায় কোনো বিঘ্ন না ঘটে আর দ্বিতীয়তঃ মেয়েটির মধ্যে এক অদ্ভুত রকমের আকর্ষণ আছে বিশেষত তার কথা বলার ভঙ্গিমায় এবং আচার-আচরণে তার ভারিত্বে তার পারসোনালিটিতে সেই দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করে পরীক্ষা কেমন হচ্ছে এটুকু জিজ্ঞাসা করবার মতন শক্তি বা সৎ সাহস কোনটাই ওই পরীক্ষকের হয়নি। হ্যাঁ মাঝেমধ্যে দু-একবার যেতে হয়েছিল ওই লুজ শিটটুকু দেবার জন্য। ব্যাস ওটুকুই দেওয়ার পরেই পরীক্ষক হাফ ছেড়ে বেঁচেছেন। ওই ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি আর কি! বরং পরীক্ষক অনেক বেশি তৃপ্ত ছিলেন অনেক দূর থেকে ওই ভারিত্ব ওই পার্সোনালিটি ওই সকলের থেকে আলাদা এক অনুভূতিতে ওকে প্রত্যক্ষ করতে।

পরীক্ষক সেই মেয়েটির চেহারা এবং তার লেখার সেই নিবিষ্টতা অনেকক্ষণ ধরে মনে মনে ভাবলেন। তাঁর জীবনে বহু ছাত্র-ছাত্রী এসেছে, কিন্তু এই মেয়েটির মতো কারো প্রতি এমন আকর্ষণ বোধ করেননি। নিজের মনে একটা প্রশ্ন তুললেনঃ হয়তো এটাই প্রকৃত প্রভা, এক নিঃশব্দ প্রভাব, যা শব্দের চেয়েও গভীর।

শরীরী আকর্ষণ নয় কিন্তু এমন আকর্ষণ ক্ষণিক সময়ের মধ্যে অনেকেই মনে রেখে যায়। সময়ের ঢেউ অনেক কিছুকেই মুছে দেয় কিন্তু কিছু মুখ, কথা এভাবেই ওম খায় আমাদের মনের মধ্যে।

হঠাৎ মনে আসল সমুদ্রের তীরের কথা।

রহস্যময় গ্রন্থ

শুভদীপ ঘড়া

পঞ্চম সেমেস্টার, কম্পিউটার সাইন্স ডিপার্টমেন্ট

রহস্যময় গ্রন্থ যুগে যুগে পাঠক, পণ্ডিত এবং অজানার অনুসন্ধানকারীদের মুগ্ধ করেছে। এই রহস্যে মোড়া গ্রন্থগুলি, প্রায়ই গোপনীয়তায় আবৃত এবং অস্পষ্ট বিষয়বস্তুতে পূর্ণ। আবার কোনো বই অজানা কোনো ভাষায় লেখা যা এখনও পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। কোনো বই আবার অদ্ভুত, অবাস্তব চিত্রতে ভর্তি। কিছু বই থেকে গুপ্তবিদ্যা, যাদুবিদ্যা, বিজ্ঞান, অ্যাসট্রোনমি ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়, যা বাস্তব নাকি কল্পনাপ্রসূত তা নিয়ে এখনও দ্বিধাগ্রস্ত গবেষকরা। কোনো বই থেকে সন্ধান পাওয়া যায় কোনো প্রাচীন সভ্যতার, তাদের সমাজ-সংস্কৃতি এবং দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কের ধারণা। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে কার্বন ডেটিং-এর সাহায্যে বইগুলির রচনাকাল জানা গেলেও কিছু কিছু বই-এর লেখকের নাম আজও জানা যায়নি। বইগুলিকে ঘিরে আছে রহস্য, ভয়, অদ্ভুত কল্পনার মিশ্রণ বা কোনো গল্প। এমনি কিছু রহস্যময় বই নিয়ে নীচে আলোচনা করা হলো:

Le Dragon Rouge: *Le Dragon Rouge* একটি French Phrase যার ইংরেজি অর্থ 'The Red Dragon'। এটি একটি রহস্যময় এবং বিতর্কিত বই যা কালো যাদু বা ডেমনোলজির (অসুরবিদ্যা) সঙ্গে সম্পর্কিত। এই বইটি Grimoire (যাদুবিদ্যার বই) হিসেবে বিখ্যাত। এই বইটির রচনাকাল অজ্ঞাত। তবে ধারণা করা হয় যে বইটি ১৭শ-১৮শ শতকে রচিত। এই বইটি পশ্চিমি অকল্ট (occult) চর্চার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। বিভিন্ন occultist-দের ধারণা বইটি নাকি কোনো এক প্রসিদ্ধ রাজার লেখা, যিনি যাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। অনেকে বইটিকে black magic-এর textbook বলে মনে করেন। "Red Dragon" একটি পৌরাণিক dragon যা শক্তি, বিপদ এবং প্রাচীন জ্ঞানের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বইটি বেশ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত, বইটিতে বিভিন্ন জটিল আচার অনুষ্ঠান বর্ণনা করা হয়েছে। যেগুলোর জন্য নির্দিষ্ট উপকরণ, চিহ্ন এবং মন্ত্রের প্রয়োজন। এর মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক আচার হলো "রেড ড্রাগন" আহ্বান করা যা একটি শক্তিশালী এবং বিপজ্জনক দানব। এই গ্রন্থটি বিভিন্ন জটিল শক্তি দ্বারা পূর্ণ যেগুলি বিভিন্ন দানবীয় শক্তি এবং অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। এই বইটি কালো যাদু এবং অতিপ্রাকৃত শক্তির সঙ্গে যুক্ত বিপদের ব্যাপারে সতর্কতা প্রদান করে। *Le Dragon Rouge* একটি আকর্ষণীয় এবং বিতর্কিত গ্রন্থ যা কালো যাদু এবং অকল্টের অন্ধকার দিক সম্পর্কে ধারণা দেয়।

The Voynich Manuscript: *The Voynich Manuscript* বইটি বিশ্বের সবচেয়ে রহস্যময় বইগুলোর মধ্যে একটি। এই প্রাচীন গ্রন্থটি একটি অজানা লিপিতে লেখা এবং অদ্ভুত চিত্রবলিতে পূর্ণ, যা বছরের পর বছর ধরে ভাষাতত্ত্ববিদ, সাংকেতিকবিদ এবং গবেষকদের বিভ্রান্ত করে আসছে। বইটির লেখকের নাম অজ্ঞাত। এই পাণ্ডুলিপিটির নামকরণ করা হয়েছে পোলিশ বই ব্যবসায়ী Wilfrid Voynich-এর নামে, যিনি ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে বইটি ক্রয় করেছিলেন।

এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হাতে লেখা এবং গ্রন্থটি একটি অজানা লিপিতে লেখা। যা আজ পর্যন্ত কেউ পড়তে বা বুঝতে সক্ষম হয়নি। পাণ্ডুলিপিটি প্রায় ২৪০ পৃষ্ঠার, সাইজ ২৩.৫ সেমি × ১৬.২ সেমি × ৫ সেমি। এই বইটি Velum (পশুচর্ম) দিয়ে তৈরি। কার্বনডেটিং অনুযায়ী বইটি ১৪০৪-১৪৩৮ সালের মধ্যে রচিত।

এই পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্ন গাছের বিস্তারিত চিত্র আছে,

যা মানুষের কাছে অপরিচিত। গবেষকদের মতে এইগুলি সম্ভবত ভেষজ উদ্ভিদের উপস্থাপনা।

জ্যোতিষবিদ্যা: এই পাণ্ডুলিপিতে জ্যোতির্বিজ্ঞান-এর বিভিন্ন চিত্র রয়েছে। মনে করা হয় যে জ্যোতিষবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জীববিদ্যা: এতে মানব সদৃশ চিত্রবলি আছে যা মানবদের নিয়ে আলোচিত।

ফার্মাসিউটিক্যাল অংশ: এতে রাসায়নিক পাত্রের মতো পাত্র এবং গাছের চিত্র আছে।

লিপির অংশ: এই অংশে ধারাবাহিক পাঠ্য রয়েছে যার সঙ্গে খুব কম চিত্র রয়েছে, এটি সম্ভবত পাণ্ডুলিপির অন্যান্য অংশের ব্যাখ্যা হতে পারে।

পাণ্ডুলিপিটি বর্তমানে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের বেইনেক রেয়ার বুক এন্ড লাইব্রেরীতে (MS408) সংরক্ষিত। *The Voynich Manuscript* পাণ্ডুলিপিটি ইতিহাসের অন্যতম বড়ো ধাঁধা। এর অজানা পাণ্ডুলিপি, অদ্ভুত চিত্র এবং অজানা উৎস একে মানুষের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

Liber Linteus Zagrabiensis (The Linen Book of Zagreb): *Liber Linteus Zagrabiensis* একটি ল্যাটিন বাক্য যার অর্থ 'The Linen Book of Zagreb'। এটি এট্রুস্ক্যান (Etruscan) ভাষায় লেখা দীর্ঘতম পরিচিত পাঠ্য। বইটি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে এট্রুস্ক্যানদের দ্বারা রচিত হয়েছিল, যারা বর্তমান ইতালির প্রাচীন সভ্যতা। গবেষকদের মতানুসারে এটি সম্ভবত একটি ধর্মীয় পাঠ্য। পাঠ্যটি লিনেন কাপড়ে লেখা হয়েছিল এবং এই পাঠ্যটি ১২টি কলমে বিভক্ত ছিল, এখন যদিও কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত বা অপাঠযোগ্য।

১৯শ শতকে পাঠ্যটি ক্রোয়েশিয়ার জাগ্রেবে একটি অস্বাভাবিক প্রেক্ষাপটে পাওয়া যায়: ১৮৪৮ সালে মিহাজলো বারিচ (Mihajlo Baric) নামে একজন Hungarian Royal Chancallery-এর নিম্ন র‍্যাঙ্কিং ক্রোয়েশিয়ান কর্মকর্তা তার পদ থেকে পদত্যাগ করে মিশরসহ বিভিন্ন দেশ সফর শুরু করেন। আলেকজান্দ্রিয়াতে থাকাকালীন তিনি ভ্রমণের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে একটি মহিলা মমি সম্বলিত সারকোফ্যাগাস কিনেছিলেন। যা তিনি তার বারিচ, ভিয়েনার বাড়িতে রেখেছিলেন। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যুর পর ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে তার পরিবার মমিটিকে State Institute of Croatia (বর্তমানে জাগরেবের প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর)-কে দান করেন। তাদের ক্যাটালগে এটিকে নিম্নরূপে বর্ণনা করা হয়েছে:

"Mummy of a young woman (with wrapping removed) standing in a glass case and held upright by an iron road. Another glass case contains the mummy's bandages which are completely covered with writing in an unknown and hitherto un-deciphered language representing an outstanding treasure of the National Museum."

গল্পটি থেকে জানা যায় লিনেন কাপড়ে লেখা পাঠ্যটি মমির মোড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল(কার্টনাজ নামক একটি পদ্ধতি)। গবেষকরা মনে করেন এটি একটি আচারিক পাঠ্য। যা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসবের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই পাঠ্যটি শুধু এট্রুস্ক্যান ধর্মীয় জীবনের জানালা নয় বরং প্রাচীন সভ্যতাগুলির সংরক্ষণ ও বোঝার জটিলতাও তুলে ধরে।

The Book of Soyga: *The Book of Soyga* একটি রহস্যময় এবং প্রাচীন পাণ্ডুলিপি যা শতাব্দীজুড়ে পণ্ডিত এবং ইতিহাসবিদদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। এটি একটি ল্যাটিন গ্রন্থ, যা ১৬ শতকের মধ্যে লেখা শুরু হয়েছিল বলে বিশ্বাস করা হয়। যদিও এর সঠিক উৎস এবং লেখক সম্পর্কে কোনো স্বচ্ছ ধারণা নেই। এই বইটির একটি অনুলিপি একজন ইংরেজ গণিতজ্ঞ, জ্যোতিষী এবং ওকাল্টিস্ট জন ডি-এর মালিকাধীন ছিল। জন ডি-এর মৃত্যুর পর ১৯৭ পৃষ্ঠার এই বইটি রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যায় এবং ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে এই বইটির দুটি সংকলন পৃথিবীর সম্পূর্ণ দুটি আলাদা প্রান্তে পাওয়া যায়। একটি British Library (Sloane MS8) এবং অন্যটি Bodlelan Library (Bodley MS. 908) বইটি বিভিন্ন

ধরনের রহস্যময় পাঠ, সরণী এবং কোড ধারণ করে।

এটিতে জাদুকরী বিদ্যা এবং রসায়ন শাস্ত্রের মিশ্রণ বর্ণিত হয়েছে। ডি. এই বইটির প্রতি গভীর আগ্রহী ছিলেন এবং এটি ডিকোড (decode) করার জন্য অনেক সময় ব্যয় করেছেন। ডির ব্যক্তিগত কপিটি মার্জিনাল নোট এবং মন্তব্যে পূর্ণ , যা অনেক সংশয়জনক মন্তব্যের বিষয় হয়ে উঠেছে ।

Codex Seraphinianus: *Codex Seraphinianus* একটি রহস্যময় বই, যা ইতালীয় শিল্পী Luigi Serafini (লুইজি সিরাফিনি) রচনা করেছেন। এটি প্রথম ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এটি কাল্পনিক এবং অতিপ্রাকৃত জগতের "encyclopedia" হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। বইটি পরাবাস্তবতাবাদ, ফ্যান্টাসি এবং অদ্ভুততার উপাদানে পূর্ণ। বইটি তার বিস্তারিত, জীবন্ত চিত্রকলা এবং সম্পূর্ণ কল্পিত ভাষার জন্য বিখ্যাত।

বইটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত, প্রতিটি অংশ একটি encyclopedia প্রবেশ পত্রের মতো, তবে বইটি পুরোপুরি কল্পিত প্রাণী, উদ্ভিদ এবং দৃশ্যাবলী দিয়ে সাজানো। চিত্রগুলো অত্যন্ত বিস্তারিত, কিছু জীববিদ্যা সংক্রান্ত ডায়াগ্রামের মতো, আবার কিছু বিভ্রান্তিকর এবং স্বপ্নের দৃশ্যের মতো। বইটি সম্পূর্ণভাবে একটি কাল্পনিক লিপিতে লেখা। অসংখ্য প্রচেষ্টার পরও এটি অনুবাদ করতে কেউ সক্ষম হননি যা বইটির রহস্যময় আবহকে আরও গভীর করেছে।

এই বইটিকে বিভিন্ন বিষয়বস্তু আছে, যেমন অজানা প্রাণী, অজানা গাছ, যন্ত্রপাতি এবং অদ্ভুত সমাজ রীতিনীতি। যেমন এমন একটি ফল যেটি থেকে রক্ত পড়ছে, চলতে পারা গাছ, এমন একটি ফল যা চেয়ারের আকৃতিতে জন্মেছে। একটি সৈনিক যার হাত টাই একটি বন্দুক, একজন মহিলা কুমিরের সঙ্গে সঙ্গম করে কুমিরে পরিণত হয়ে যাচ্ছেন, এমন একটি গাছ যার ফুল মাটির নিচে হয়েছে, অদ্ভুত প্রাণী জগৎ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। এই বইটির জটিলতা, অস্বচ্ছতা, অবাস্তবতা এবং স্বপ্নিলতা এটিকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে ।

The Ripley Scroll: *The Ripley Scroll* একটি আকর্ষণীয় শিল্পকর্ম যা আলকেমির সঙ্গে সম্পর্কিত। (প্রাচীন এবং মধ্যযুগে একটি রহস্যময় বিজ্ঞান চর্চাকে আলকেমি বলা হয় যে মূলত রসায়ন, দর্শন এবং আধ্যাত্মিকতার মিশ্রিত একটি প্রাচীন পদ্ধতি) সঙ্গে সম্পর্কিত। বইটি ইংরেজ আলকেমিস্ট (যিনি আলকেমি নিয়ে চর্চা করেন) জর্জ রিপলির নামে নামকরণ করা হয়। কিন্তু বইটি জর্জ রিপলি লিখেছেন কিনা তা নিয়ে গবেষকরা এখনও নিশ্চিত নন।

বইটির প্রতি পৃষ্ঠা রহস্য এবং বিস্ময়ে পরিপূর্ণ। বইটি মূলত আলকেমি নিয়ে লেখা। বইটিতে অনেক চিত্র শিল্পীয় প্রতীকী ব্যবহার করা আছে। যেখানে আলকেমি প্রতীক, পৌরাণিক জীব এবং রহস্যময় পাঠ্য মিলিত আছে। সাধারণ চিত্রশিল্পের মধ্যে ড্রাগন, পাখি, সাপ এবং বিভিন্ন গাছের ছবি আছে যা আলকেমিস্টরা আলকেমি চর্চায় ব্যবহার করেন। চিত্রগুলির সঙ্গে একটি করে ছন্দবদ্ধ কবিতা রয়েছে, যা রূপক এবং রহস্যময় উপায়ে আলকেমিক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে। বইটি ফিলোসফারস স্টোন তৈরির প্রক্রিয়াকে উপস্থাপন করে, যা আলকেমির কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। আলকেমিস্টদের মতে ফিলোসফারস স্টোন এমন একটি পদার্থ যা অমরত্ব প্রদান করে এবং সাধারণ ধাতুকে সোনায় রূপান্তরিত করতে পারে। এই বইটিতে রূপান্তর বিদ্যা নিয়ে বলা আছে। রূপান্তর বিদ্যা হলো এমন একটি বিদ্যা যা কোনো প্রাণীকে নিজের রূপ দেওয়া যায়। বইটিতে আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি নিয়েও বলা হয়েছে।

এটি আলকেমির ইতিহাস ও দর্শনের অধ্যয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হিসেবে রয়ে গেছে এবং বইটি থেকে আলকেমিস্টদের বিশ্বাস ও চর্চা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

শুধু এই কয়েকটা বই না, আরও অনেক বই আছে যা রহস্যে ঘেরা, বইগুলিকে নিয়ে প্রচলিত আছে অনেক অলৌকিক কাহিনী যা মানুষকে বিস্মৃত করে। মানুষকে বইগুলির প্রতি আকৃষ্ট করে। বইগুলি পড়ে দেখার আগ্রহ সৃষ্টি করে।

SUBCONSCIOUS MIND

Priya Pal

Third Semester, Computer Science Department

Subconscious mind is a part of our mind that process information and influences behaviour without conscious awareness. It controls automatic functions like breathing and heart rate and stores memories, beliefs and past experiences. 95% of our behaviour and the decisions we take from our subconscious mind not conscious mind. Conscious mind is only for around 5% of our cognitive activities such as decisions, emotions, actions and behaviour. Our current situation is manifested based on our core beliefs, thoughts, feelings, emotions which are stored in subconscious mind. It creates our reality. If we want to transform our current reality, we must check our subconscious thoughts, and then we must work to change these thoughts.

From Law of Attraction perspective, what we focus on is what we get in life. This focus is both conscious and subconscious in nature. Since we know that the subconscious mind is 95% of our autopilot foundational belief system, we can see that what we attract in our life is due to the energy that vibrates from within us. That energy is our subconscious energy. It is the thoughts stored in our subconscious mind that bring to us, in an auto-pilot fashion, what we see on the daily basis. Every time we focus on something, it gets ingrained in our subconscious mind. The more we focus on it, the more momentum we build up in that area and the more you start to attract similar situations of the same vibration.

For example, as a child, if you witnessed one of your parents having an extramarital affair, you undoubtedly had strong emotions associated with this event. What you witnessed as well as your emotional response to this event has been stored in your subconscious mind and as you grew up, if you continued to feed that energy with that of mistrust of people in relationship, then you have a stronger tendency to attract these types of relationships into your reality.

Another example is that of lack. As a child, if you grew up in an environment where there was energy of lack when it related to money, then this emotional trigger is stored in your subconscious mind as well. As a result, in your adult life, when you think about money, you think about lack because that is the auto programming you witnessed time and time again as a child.

So, the subconscious mind is very powerful and as a result when we attract a different reality. So, we own can change our reality in our favour. We have will power to create our good luck.

To change subconscious thoughts:

i) Check the thought patterns

ii) Find the root cause of this thought

iii) Bring all emotions of this thought in awareness

iv) Release this emotion and thought by simply watching those without reacting.

v) Practice mindfulness on daily basis for releasing

vi) Follow breathing exercise which reduces thoughts

vii) Use positive affirmation on daily basis

viii) Do meditate everyday

ix) Accept every situation in positive way

How to attract specific life by using power of subconcious mind:

The formula is Ask, Believe, Action and Receive.

i) Ask: The key is to focus on and ask for what you want. Remember that what you think about, read about, talk about and give your attention to, are actually requests that you're sending out to the Universe.

So you must start being intentional regarding what you think about all day. Feeling excited, enthusiastic, passionate, happy, joyful, loving, appreciative, prosperous and peaceful are thoughts and feelings that generate positive vibrations within you. Start intentionally creating your future in your mind, then let the Universe figure out how to manifest it.

After all, it's phenomenally good at aligning the people, situations, money, resources and opportunities necessary to bring about your desired goals.

ii) Believe: The next step is to believe you will get what you want, then take action. What does it mean to believe you'll get what you want?

It means maintain a positive expectancy; going about your day with certainty-knowing that you've put your future in the hands of a power that is greater than yours… and that it will deliver. Always act as if what you want is on its way.

It's simply a matter of you deciding with conviction that what you want will absolutely happen.

This is not always easy. Many people have limiting beliefs which keep them from allowing abundance and happiness into their lives.

If this describes you, realize that you must first change your limiting beliefs into thoughts that you are deserving, worthy, lovable, desirable, and capable-as well as smart enough, strong enough, attractive enough, rich enough, good enough and "enough" in every other way that matters to you.

iii) Take Action: Of course, once you believe that you'll get what you want, the second part of the belief stage is to take action. Taking the actions that would take to create your desired result affirms your belief that what you want is within reach.

After all, you wouldn't be taking action if you didn't expect your future situation to show up, would you? So your taking action is a demonstration of your belief.

iv) Receive: The final step of this formula is to receive what you want by becoming a vibrational match for it.

What is the meaning of vibrational match?

It's that you, me – everyone on the planet is like an individual radio station that is broadcasting on a specific frequency.

If you want to listen to jazz, you have to tune your dial to a station that broadcasts jazz, not one that plays hip-hop or country. Likewise, if you want more abundance and prosperity in your life, you have to tune the frequency of your thoughts and feelings to ones of abundance and prosperity.

If you follow this formula you will attract more abundance into your life.

স্বনির্ভর দল ও স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্ব-রোজগার যোজনা: একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

শুভ্র সরকার

অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ

পাশাপাশি বসবাসকারী গ্রামের মানুষ দল বেঁধে নিজেদের উন্নয়নের কাজ নিজেরাই করছেন এই অভিজ্ঞতা পশ্চিমবঙ্গে নতুন নয়। রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা ও সমসাময়িক বিভিন্ন উদ্যোগের কথা বাদ দিলেও একথা অনস্বীকার্য যে সাতের দশকের গোড়া থেকেই এই ধরনের বিভিন্ন প্রয়াস মূলত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তে শুরু হয়। পঞ্চায়েতের উদ্যোগে স্বনির্ভর দল গঠনের কাজ শুরু হল বলা যায় গ্রামীণ নারী ও শিশু বিকাশ কর্মসূচি (ডোকরা) রূপায়ণের মধ্য দিয়ে। সেই যাত্রা গতি পায় ১৯৯৯ সালে স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা কর্মসূচি আসার পর।

বেশ কয়েকদশকের বেশি হতে চলল গ্রাম পঞ্চায়েত এই স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে উন্নয়নের কাজে শামিল হয়েছে, একই সঙ্গে স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার রূপায়ণের কাজও ব্যাপৃত রয়েছে। ভালোমন্দ নানা ধরনের অভিজ্ঞতাই হয়েছে আমাদের। দশ বছরের এই অভিজ্ঞতার নিরিখে যে বিষয়গুলি উঠে এসেছে আজকের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সেগুলিই এই লেখায় তুলে ধরার চেষ্টা হল।

স্বনির্ভর দল গঠন: যদিও পশ্চিমবঙ্গে স্বনির্ভর দলের সংখ্যা বহুল পরিমাণে বেড়েছে, কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য এখন বহু গরিব পরিবার বিশেষত মহিলারা স্বনির্ভর দলের বাইরে রয়ে গিয়েছেন। বহু গ্রাম পঞ্চায়েত এখন স্বনির্ভর দল এবং স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগান যোজনাকে সমার্থকভাবে। এবং এর বাইরে যে দলগুলি রয়েছে তাদের সব তথ্যও পঞ্চায়েতের কাছে নেই। আসলে স্বনির্ভর দল তো কোনো কর্মসূচি নয়, স্বনির্ভর দল হল পাশাপাশি বাস করা পরিবারের মানুষদের বিশেষত মহিলাদের সংগঠন। পঞ্চায়েতের কাজ হল গ্রামের গরিব মানুষ বিশেষত সমস্ত মহিলাকে স্বনির্ভর দলের আওতায় আনা। সবাইকে স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম যোজনার সব সুযোগ বা পরিষেবা হয়তো দেওয়া যাবে না কিন্তু আরও তো অনেক কর্মসূচি রয়েছে। পঞ্চায়েতের লক্ষ্য হবে গ্রামে সব গরিব পরিবারের মহিলাদের স্বনির্ভর দলে সংগঠিত করা। দল গঠনের সময় অবশ্যই খেয়াল রাখা দরকার যে দলের সদস্যরা যেন একই পাড়ার একই এলাকার বাসিন্দা হন।

গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের কর্মী ও স্বনির্ভর দলের তথ্য রাখা: বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে স্বনির্ভর দলের সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠা, ব্যাঙ্ক, সমবায় সমিতি, ব্যক্তি মানুষ, পঞ্চায়েত প্রতিনিধি, এরকম অনেকেই ব্যাপৃত রয়েছেন স্বনির্ভর দল তৈরির কাজে আবার পুরনো স্বনির্ভর দলের দেখাদেখি তাদের সাহায্যেই বহু জায়গায় অনেক দল তৈরির কাজে। আবার বহু জায়গায় অনের দল তৈরি হচ্ছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে এই রকম সব দলের খোঁজখবরও সব জায়গায় নেই। অথচ স্বনির্ভর দলের সদস্যরা অসুবিধায় পড়লে প্রথমেই কিন্তু ছুটে আসবেন গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছেই। আবার এই স্বনির্ভর দলের সদস্যরা তো গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকারই বাসিন্দা। কাজেই সব ধরনের স্বনির্ভর দলের দেখভাল করা গ্রাম পঞ্চায়েতের একটা বড় দায়িত্ব। আর সব দলের তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে থাকাটাও খুব জরুরি। আর সেইজন্যই গ্রাম পঞ্চায়েতকে সহায়তা করার জন্য প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে দুইজন মহিলা স্বনির্ভর

দলের দুজন প্রতিনিধিকে চিহ্নিত করেছে স্বনির্ভর দলের দেখভাল করার জন্য। এঁরাই হলেন গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের সম্পদকর্মী। এঁদের কাজ মূলত—

- প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক সংসদ ওই সংসদের সব স্বনির্ভর দলকে নিয়ে সভা করা।
- ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের সব স্বনির্ভর দলের তথ্য রাখা (এর জন্য প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্দিষ্ট নির্দেশ খাতা দেওয়া হয়েছে।)

স্বনির্ভর দলের সহায়তা বাড়ানো: স্বনির্ভর দল তৈরি হলেই হল না, সংগঠন হিসাবে শক্তিশালী হতে হলে তাদের সক্ষমতা বাড়ানো খুব জরুরি। এর জন্য দরকার ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ, ধারাবাহিক শিবিরের আয়োজন করা। স্বনির্ভর দলের জন্য কত ধরনের প্রশিক্ষণ হতে পারে তা জানিয়ে একটি নির্দেশিকা জারি হয়েছে। যে প্রশিক্ষণের আয়োজনগুলি অবশ্যই করা দরকার সেগুলি হল—

স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনার সঙ্গে সংযুক্ত দল গঠনের চিত্র (জেলাওয়াড়ি)

ক্রমিক	জেলা	স্বনির্ভর দলের সংখ্যা
১	বাঁকুড়া	১৫০৬৪
২	বীরভূম	১৮১৭১
৩	বর্ধমান	১৫৯৭০
৪	কোচবিহার	১৪৩৭৪
৫	দক্ষিণ দিনাজপুর	৯৫৩৫
৬	দার্জিলিং	২৮৭৪
৭	হুগলি	৭৩৩৭
৮	হাওড়া	৭২১৬
৯	জলপাইগুড়ি	২০৫৬৮
১০	মালদা	১৫৯৫১
১১	পূর্ব মেদিনীপুর	১৯১৫৫
১২	পশ্চিম মেদিনীপুর	২৫১৫৭
১৩	মুর্শিদাবা	২৫৬০৩
১৪	নদীয়া	১৪১০৯
১৫	উত্তর ২৪ পরগনা	১৬৯২৯
১৬	পুরুলিয়া	১৯১১৪
১৭	শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ	২৪৮৬
১৮	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	১৪৬৫১
১৯	উত্তর দিনাজপুর	৯৪৪৯
	মোট—	২৭২৮১৩

তথ্য কেবলমাত্র এসজিএসওয়াই-এর সঙ্গে সংযুক্ত দলের

- যেখানে স্বনির্ভর দল তৈরি করা যায়নি সেখানে গ্রামবাসীদের নিয়ে বিশেষ শিবির করা।
- নতুন তৈরি স্বনির্ভর দলের সদস্যদের জন্য দল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ।
- নতুন দলের পদাধিকারীদের খাতাপত্র/হিসাব রাখার প্রশিক্ষণ।
- ছ-মাস বা তার পুরনো দলের জন্য ঋণের ব্যবহার ও আয় বাড়ানোর প্রশিক্ষণ।
- সব দলের সদস্যদের জন্য ঋতুভিত্তিক জীবিকা সংক্রান্ত শিবির (যেমন বর্ষার সময় ছাগলের অসুখ, সহজে মুরগি/মাছের খাবার তৈরি ইত্যাদি নানা বিষয়ে শিবির হতে পারে।
- এছাড়াও জীবিকাভিত্তিক নানা বিষয়ে প্রয়োজনভিত্তিক প্রশিক্ষণ।
- কোনো স্বনির্ভর দলের সদস্য যদি তাঁর পেশাদারি দক্ষতা বাড়াতে চান, তবে জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়ে থাকে। এধরনের চাহিদা থাকলে ব্লকে জানান।

এইরকম কিছু প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা, তার আয়োজন গ্রাম পঞ্চায়েতকেই করতে হবে।

স্বনির্ভর দলের সদস্যদের জীবিকা—তাঁদের আয় বাড়ানো: আমরা সবাই জানি যে স্বনির্ভর দল সংগঠিত হওয়ার পর প্রত্যের দলই তাদের নিজস্ব সঞ্চয় ভাণ্ডার তৈরি করে। এই সঞ্চয় ভাণ্ডারই হল দলের প্রাণ, তাদের মূল চালিকাশক্তি। অল্প করে জমানো টাকা ও পরে ব্যাঙ্ক বা সমবায় থেকে ঋণ নিয়ে নিজেদের আয় বাড়ানোর কাজ করেন স্বনির্ভর দলের সদস্যরা। আর এই কাজে নিজেদের আয় বাড়ানোর কাজ করেন স্বনির্ভর দলের

সদস্যরা। আর এই কাজে পঞ্চায়েতের সাহায্য অবশ্যই দরকার। বেশিরভাগ স্বনির্ভর দলের সদস্যই হাঁস, মুরগি, ছাগল, ভেড়া পুষে, জমি বা পুকুর লিজ নিয়ে চাষ করে, উঠোনে শাক-সব্জি, গাছপালা লাগিয়ে, মুড়ি ভেজে, ধান সিদ্ধ করে এইরকম নানা কাজের মাধ্যমে সংসারের দু-পয়সা রোজগার করে থাকেন। ধীরে ধীরে তাদের উৎসগুলিকে শক্তপোক্ত করে আয় বাড়ানো স্বনির্ভর দলের একটি বড় উদ্দে শ্য। দেখা যাক পঞ্চায়েত কীভাবে তাদের সাহায্য করতে পারে।

- ২য় শনিবারের মিটিং বা অন্য কোনোভাবে খবর রাখুন, দলের সদস্যদের ঋতুভিত্তিক চিরাচরিত জীবিকাগুলি কী কী, তাদের অসুবিধাগুলিই বা কোথায়।
- দেখা যাবে অনেক সমস্যা পঞ্চায়েত নিজেই সমাধান করে ফেলতে পারছে আবার কিছু সমস্যা যার জন্য অন্য কারোর সহায়তা দরকার সেইগুলি তাদের কাছে পাঠিয়ে দিন।
- পঞ্চায়েতের নিজস্ব পুকুর বা জমি বা জলা বা এন.আর.ই.জি.এ-তে সংস্কার করা পুকুর-জলা লিজে স্বনির্ভর দলকে দেওয়া যায় তাতে সেখানে মাছ চাষ করে তারা দু-পয়সা আয় করতে পারে।
- বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা বা ব্যক্তির সঙ্গে তাদের পরিচয় বা যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া।
- বিভিন্ন শিবির বা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

স্বনির্ভর দলের নিজস্ব সংগঠন তৈরি করা: পাড়ায় পাড়ায় তৈরি হওয়া স্বনির্ভর দলের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ খুব জরুরি। সে রকমই জরুরি তাদের নিজস্ব সংগঠন তৈরি করা। এই উদ্দেশ্যেই প্রত্যেক গ্রাম সংসদে তৈরি হওয়া সব স্বনির্ভর দলের নিজস্ব সংগঠন উপসংঘে তৈরি হচ্ছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের দেখা দরকার সব সংসদে যেন ধীরে ধীরে এই উপসংঘ গড়ে ওঠে আর সব স্বনির্ভর দল যেন এই উপসংঘে যুক্ত হতে পারে।

এক নজরে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় তৈরি হওয়া সংঘ—

ক্রমিক	জেলা	স্বনির্ভর দলের সংখ্যা	সংঘের সংখ্যা
১	বাঁকুড়া	৮৬২	৫
২	বীরভূম	৮৬৮	১১৯
৩	বর্ধমান	৩৮৯	৭৩
৪	কোচবিহার	১১৪৪	৭৫
৫	দক্ষিণ দিনাজপুর	৯২৪	১০
৬	দার্জিলিং	১০৫	৪৮
৭	হুগলি	১৫৮	৭১
৮	হাওড়া	২৬২	৮২
৯	জলপাইগুড়ি	১৫২০	১০৩
১০	মালদা	২১৭	২৮
১১	পূর্ব মেদিনীপুর	১৬১১	১২২
১২	পশ্চিম মেদিনীপুর	৯৯৬	৭২
১৩	মুর্শিদাবাদ	৯২৮	৫১
১৪	নদীয়া	০	১৮৮
১৫	উত্তর ২৪ পরগনা	৮৬৩	৭১
১৬	পুরুলিয়া	৩৮০	২২
১৭	শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ	১২২	১৪
১৮	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	৫৩৮	২৯
১৯	উত্তর দিনাজপুর	৬৫৩	৬৫
	মোট—	১২৩৬০	১২৪৮

গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে সংঘ যদি ভালো কাজ করে তাহলে তাদের পরিকাঠামো ও অন্যান্য সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা (এস জি এস ওয়াই) ও স্বনির্ভর দল এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হল গরিব মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি। আর এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য জোর দেওয়া হয়েছে স্বনির্ভর দলের গঠন, তাদের সক্ষমতা বাড়ানো ও তাদের কাছে ঋণ ও অনুদানের সুযোগ পৌঁছে দিয়ে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটানো। এই কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণ, পরিকাঠামো, বিমা, ঋণ ও বিপণনের সহায়তা দেওয়া হয়। যেহেতু কর্মসূচির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন গ্রামের গরিব মানুষ তাই সেসব স্বনির্ভর দলের

অধিকাংশ সদস্য (ন্যূনতম ৭০ শতাংশ) দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবার থেকে এসেছেন সেই দলগুলিই এই কর্মসূচির মূল সুবিধাগুলি পেতে পারে।

এই কর্মসূচিতে ছ-মাসের পুরানো দলগুলিকে মূল্যায়নের পর আবর্তনীয় তহবিলের সুবিধা দেওয়া হয়। এই সুবিধাটি ব্যাঙ্কের ক্যাশ ক্রেডিট ধরনের ঋণের সুবিধা, যেখানে থেকে ঋণ নিয়ে গরিব স্বনির্ভর দলগুলি তাদের আয় বাড়াতে পারে। আবর্তনীয় তহবিল ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারলে রয়েছে প্রকল্প ঋণের সুযোগ।

জানেন তো?:

● আবর্তনীয় তহবিল (ক্যাস- ক্রেডিট ধরনের ঋণ) স্বনির্ভর দল যতদিন চাইব ততদিন চালাতে পারে। দল যদি এই তহবিল থেকে নিয়মিত ঋণ নেয় ও ফেরত দেয় তাহলে প্রতি বছর এই অ্যাকাউন্টের ঊর্ধ্বসীমা ব্যাঙ্কের বিবেচনা করে বাড়ানো উচিত।

● আবর্তনীয় তহবিল হল বিশেষ ধরনের ঋণের সুযোগ। এই তহবিল যতটা তোলা হবে ততটাই ঋণ, ততটার উপরই সুদের হিসাব হবে।

● আবর্তনীয় তহবিল বা সঞ্চয় তহবিল থেকে টাকা তোলার জন্য অবশ্যই দলের মিটিং করতে হবে। প্রকল্প ঋণ বারে বারে নেওয়া যায়। প্রকল্প ঋণ নেওয়া মানে সকলে একসঙ্গে এক ছাদের তলায় বসে অর্থনৈতিক কাজ করবেন তা নাও হতে পারে। আবার দল একাধিক প্রকল্পও থাকতে পারে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ:

● এলাকার যে গরিব স্বনির্ভর দলগুলির বয়স ছ-মাস বা তার বেশি তাদের প্রথম মূল্যায়ন ও যেগুলির বয়স এক বছর বা তার বেশি তাদের দ্বিতীয় মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা।

● প্রথম মূল্যায়নে উত্তীর্ণ দলগুলির ক্যাশ-ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করা।

● প্রতি মাসে ব্যাঙ্ক থেকে সম্পদকর্মীর সাহায্যে ঋণের তথ্য নিয়ে দেখা দলগুলি সঠিক পরিমাণে ঋণ পাচ্ছে কিনা।

● দলগুলি ঋণ নিয়ে আয় বাড়াতে পারছে কিনা তার খোঁজ খবর রাখা। প্রয়োজনে পঞ্চায়েত সমিতিকে জানানো।

● সময়মতো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

● গ্রামের সব গরিব মহিলা যাতে স্বনির্ভর দলে যুক্ত হতে পারেন তার উদ্যোগ নেওয়া।

এই রকম আরো অনেক কাজ: গ্রাম পঞ্চায়েতের সঠিক সহায়তায় স্বনির্ভর দল ও তাদের সংঘ, উপসংঘগুলি গ্রামের উন্নয়নে পঞ্চায়েতের সহযোগী সামাজিক সংগঠন হিসাবে নিশ্চয়ই গড়ে উঠবে। এই আশা আমরা রাখি।

ত থ্য সূ ত্র:

১) পঞ্চায়েত ও সমষ্টি উন্নয়ন, পঞ্চায়েত এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

২) সোনালী, চক্রবর্তী ও ব্যানার্জী, সোস্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অব পঞ্চায়েত

৩) প্রভাত দত্ত, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও উন্নয়ন

৪) বুদ্ধদেব ঘোষ ও গিরিশ কুমার, স্টেট পলিটিক্স এন্ড পঞ্চায়েত ইন ইন্ডিয়া

৫) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পঞ্চায়েত (ট্রেনিং সেন্টার তথ্য দপ্তর, কল্যাণী, নদীয়া)

৬) পশ্চিমবঙ্গ-পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন (পত্রিকা)

৭) সরকার, শুভ্র, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও গ্রাম উন্নয়ন, শহীদ প্রকাশনী, কল্যাণী, নদীয়া।

> "লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীকে না মিলাইয়া দিলে আজকালকার দিনে ভূমিলক্ষ্মীর যথার্থ সাধনা হইতে পারিবে না।"
>
> *—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

রবীন্দ্রনাথের গানে সভ্যতার সংকট ও বিশ্বমানবতাবোধ

ড. মহুয়া বিশ্বাস

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

সভ্যতার সংকটের সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে পূর্ব শর্ত হিসাবে আমাদের সভ্যতাকে জানা প্রয়োজন। 'সভ্যতা' শব্দটির সঙ্গে মানুষের ধারাবাহিক পরিচয়। অথচ 'সভ্যতা' এমন একটি শব্দ যার কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া সেই অর্থে অসম্ভব। কারণ হলো এর আপেক্ষিক তাৎপর্য। তবুও আমরা এর মধ্যে একটা সার্বজনীন অর্থ খুঁজে নিতে পারি। সভ্যতা মানবতারই আরেক নাম। সভ্যতা বলতে আমরা কী বুঝি? একটা পরিমণ্ডলে আচরণের নিয়ন্ত্রণ বিধি মেনে চলার মধ্যে দিয়েই প্রবেশ করে সভ্যতা। প্রাচীন শাস্ত্রের যে বাক্য আমাদের সভ্যতা সম্পর্কে ধারণা দেয় তা হলো 'সভায়াং সাধু: ইতি সভ্য:' যিনি সভায় সাধু তিনিই সভ্য। আমরা ভেবে দেখতে পারি এই সভ্যতার সঙ্গে সংকট কীভাবে জুড়ে গেল এবং তার সঙ্গে বিশ্বমানবতাও কীভাবে পাশাপাশি জায়গা করে নিল।

সভ্যতার সঙ্গে মানবতার বন্ধন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বমানবতার সংযোগ আমাদের ভাবনা, আচরণকে উন্নত করে। যে সংযোগ রবীন্দ্রনাথ রক্ষা করার চেষ্টা করে গেছেন সৃষ্টির মাধ্যমে। আমাদের ভাবনাকে উন্নত করতে, রুচিশীল করতে, সভ্য করতে, আধুনিক করতে, মানবিক করতে বিশ্বের সঙ্গে তার সংযোগ স্থাপন করতে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সেতু বন্ধনের কাজ করেছে। মানুষ কৃষির জন্য স্থায়ী হলো, প্রতিবেশী হলো, আত্মীয়-স্বজন এলো। রক্তের সম্পর্ক ছাড়িয়ে রক্তদানের সম্পর্কে ছড়িয়ে পড়ল। এভাবেই মানবতা থেকে ধীরে ধীরে এল বিশ্বমানবতা। বদ্ধঘর, জানলা দিয়ে প্রকৃতি দেখা, বাবার সঙ্গে হিমালয় দর্শন, এবং পরে বিশ্ব ভ্রমণ। জমিদারি সামলাতে শিলাইদহ। জমিদারি ভাগাভাগির কারণে বোলপুর। দুদিকে দুরকম প্রকৃতি, দুরকম সংস্কৃতি। একদিকে বহতা নদী অন্যদিকে রুক্ষ শুষ্ক ধূসর লাল মাটি। সবকেই তিনি ভালোবাসলেন, আপন করে নিলেন। সেই বৃহৎ হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে সকল মানুষ, সভ্যতা, যন্ত্রণা, প্রেম, প্রকৃতি, পৃথিবী। যে বিষয়ের সম্মুখীন হয় পৃথিবী সে বিষয় রবীন্দ্রনাথের গান অতিক্রম করে গেছে। সভ্যতা, তার সংকট এবং বিশ্বমানবতা বোধই রবীন্দ্রনাথের গানকে বিশ্বমানবের হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে।

ভৌগলিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা পৃথিবীটাকে দুটো খণ্ডে ভাগ করে থাকি—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। প্রাচ্য সভ্যতা হলো আরণ্য, যার অপর নাম মন্ত্রসভ্যতা। পাশ্চাত্য সভ্যতা হল শহুরে, যাকে আমরা বলি যন্ত্রসভ্যতা। বিবর্তনের ধারায় স্বাভাবিকভাবেই মন্ত্রের জায়গাটা দখল করে নিয়ে চলেছে যন্ত্র। ক্রমবর্ধমান বিজ্ঞানের চাপে সভ্যতা এখন যন্ত্রমুখী, মানুষ এখন রোবটমুখী। তাই হৃদয়টা এখন হৃদযন্ত্র। হাতে লেখা চিঠির বদলে 'মেইল', 'প্রিয়'/'প্রিয়া'র বদলে 'হ্যালো' বা 'হাই'। এমনই হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্তমান সভ্যতা। আমরা কি একে সভ্যতার সংকট বলব? নিশ্চয়ই না। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে সারা বিশ্বব্যাপী এ এক নব্যসভ্যতা। আমরা আগেই মেনে নিয়েছি সভ্যতা হলো এক আপেক্ষিক। প্রকৃত সভ্যতার সংকট দেখা যায় তখনই যখন মানবজীবন থেকে মানবতা বোধ হারিয়ে যায়। এই মানবতাবোধ বা বিশ্বমানবতা বোধের সন্ধানে আমরা রাষ্ট্রের দিকে ফিরে তাকাতে পারি। হিরোশিমার উপরে বর্বরোচিত আক্রমণের প্রতিবাদে মুখর হল পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলি। স্থাপিত হলো সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। ভারতবর্ষ পিছিয়ে থাকেনি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থাননীতি প্রচার করল রাষ্ট্রনীতির জগতে। যার শিকড় প্রোথিত ছিল মুণি-ঋষিদের বাণীতে—('হে অমৃতের পুত্রগণ, শোনো, এই জগতের সব কিছুই ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত, ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর')। বিবর্তনের পথে পূর্বসূরিদের শক্তি অনেক বৃহওর শক্তিতে ফিরে আসে

উত্তরসূরিদের মধ্যে দিয়ে। তাই অরণ্য সভ্যতার জনকেরা একদিন গুহা মধ্যে যা ভেবেছিলেন তাই আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রমঞ্চে সেই ভাবনাই সঞ্চারিত হলো উত্তরসূরিদের মধ্যে দিয়ে। ধীরে ধীরে রাষ্ট্রজগতে আমরা কত পরিবর্তন দেখলাম। রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, জন্মনিলগণতন্ত্র, এলো সাম্যবাদ এবং সমাজতন্ত্র। সময়ের হাত ধরে এভাবেই এলো মানবতাবোধ সেই সঙ্গে বিশ্বমানবতাবোধ। যারই অপর নাম সভ্যতা। আর যেখানেই মানবতাবোধ থেকে দূরে সরে যাওয়া, সেখানেই দেখা যায় সভ্যতার সংকট।

তাই সভ্যতার পথ বলতে বোঝায় প্রেমের পথ বন্ধুত্বের পথ, ভ্রাতৃত্বের পথ ও শান্তির পথ। সাম্রাজ্যবাদের পথ হলো হিংসার পথ, পুঁজিবাদের পথ হিংসার পথ। মানবজীবনে সাম্য ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়েই একমাত্র সভ্যতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আজও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যখন সাম্রাজ্যবাদ ও ধণতন্ত্রের হাতছানি মানুষকে আতঙ্কিত করছে, তখনও আমাদের সেই রবীন্দ্রনাথের কাছেই ফিরে যেতে হয়। আশাবাদী রবীন্দ্রনাথই বেঁচে থাকতে সাহায্য করেন আমাদের। 'সভ্যতার সংকট' নামে একটি ভাষণ তিনি দিয়ে ছিলেন এবং সেখানে বলেছিলেন—"মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ"। সভ্যতা হলো মানবতা তথা বিশ্বমানবতা। যখনই আমরা এই মানবতা থেকে দূরে সরেছি তখনই সংকটে পড়েছি। সুতরাং মানবতাবোধ জাগ্রত করার মধ্যে দিয়েই আসবে সভ্যতার সংকট মুক্তির পথ। এই বিষয়টাই রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে দিয়ে কী সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে সেটা আমরা এখানে একটু অন্বেষণ করে দেখতে পারি।

আর আমরা জানি কোনো সংস্কৃতির শুরু হয় গৃহকোণ থেকে। আগে ঘরে মহৎ হও, সেখান থেকে বিদ্যালয়ে, সেখান থেকে বৃহত্তর সমাজে। সকল সমাজকে সুস্থ বা ভালো রাখার দায়িত্বও মানুষেরই। হিংসার পথ বলতে আমরা সাম্রাজ্যবাদকে বুঝি আর সভ্যতার পথ বলতে আমরা বুঝি প্রেমের পথ মৈত্রীর পথ, ভ্রাতৃত্বের পথ ও শান্তির পথ। সাম্রাজ্যবাদের পথ হলো হিংসার পথ। পৃথিবীর সর্বত্র যখন সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের করাল হাতছানি পৃথিবীকে আতঙ্কিত করেছে, তখন আমরা আশাবাদী রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করি। তিনি গাইছেন—"হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব;/ ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভেজটিলবন্ধ" নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী/ কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী,/ বিকশিত কর প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ। শান্ত হে, মুগ্ধ হে, হে অনন্তপুণ্য/ করুণাখন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূণ্য।"

এই দ্বন্দ্ব, কুটিলতা, লোভ, হিংসা থেকে মুক্ত হয়ে এক নতুন জন্মের কথা রবীন্দ্রনাথ বলছেন। প্রেমপদ্ম বিকশিত করে শান্ত, মুক্ত, করুণাঘন ধরণীতলে, কলঙ্ক শূন্য অমৃত বাণী প্রকাশের মধ্যে দিয়েই সকলকে এগিয়ে যাওয়া ও ত্যাগ কঠিন দীক্ষার মধ্যে দিয়ে সকলের মঙ্গলময় হয়ে ওঠার কথা বলছেন তিনি। মানবতা বোধ জাগ্রত করার মধ্যে দিয়েই আসবে সভ্যতার সংকট অতিক্রম করার শক্তি। রবীন্দ্রনাথের গান সেখানে বার বার সহায়ক হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে। "বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো/ সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও"। "নয়কো বনে, নয় বিজনে, নয়কো আমার আপন মনে—। সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়, সেথায় আপন আমারও।।"

অর্থাৎ শুধু নিজের করে পাওয়া নয়, নিজের জন্য চাওয়া নয়। সবার কাছে যখন তুমি প্রিয় তখন তুমি আমারও প্রিয়। সবার জন্য যখন তুমি তোমার হাত বাড়িয়ে দাও তখন তোমার জন্য আমারও প্রেম জাগে। অর্থাৎ এই চাওয়া এই প্রেম বৃহৎ হতে শেখায় মানুষকে। বিশ্বমানবতার রাস্তা খুঁজে দেয় এই গান। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি নৈবেদ্য হিসেবে সাজিয়ে দিয়েছেন তার জীবন দেবতাকে। কখনও নিবেদন করেছেন নিজের জন্য প্রার্থনা—"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।।/ অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহামন্দময়। লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার/ মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার। তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত।"

বৈরাগ্য বা সাধনে নয় অসংখ্য বন্ধন মঝেই তিনি আসল মুক্তি খুঁজে ফিরেছেন। শুধু মনুষ্য বন্ধন নয় তিনি যোগ অনুভব করেছেন, মুক্তি খুঁজে পেয়েছেন এই পৃথিবী, আকাশ, আলোর মধ্যে দিয়ে। শুধু মানবতা বা মানুষ নয় তিনি মিশে যেতে চেয়েছেন এই পৃথিবীর প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে—

এই আকাশে আমার মুক্তি, আলোয় আলোয়।
আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে—

নিজের গণ্ডি থেকে দেশের গণ্ডি, দেশের গণ্ডি থেকে গণ্ডিহীন পৃথিবীর উদারলোকে গমনমুখী ত্রিবিধ প্রার্থনা নিজেকে জানার প্রার্থনা—

আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।

বিশ্বসেবী হওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথ বলছেন সমাজসেবী হও, হও দেশসেবী। সেবা করতে করতে সেবা ধর্মের পথিক হয়ে ওঠা সম্ভব। মানুষের জীবনে, পৃথিবীতে সংকট আসবেই। তাকে সামনে থেকে মোকাবিলা করাতেই জীবনের মাধুর্য—

সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান,
সংকটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মান।
মুক্ত করো ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধরো,
নিজেরে করো জয়।
দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।

নিজেকে দুর্বল মনে করার অর্থ নিজেকে নিজে অপমান করা। নিজের মধ্যে নিজেই কীভাবে শক্তি ধারণ করা যায় তার খোঁজ আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথের গান থেকে পাই। দুর্বলকে রক্ষা করা যেমন মানুষের ধর্ম তেমনি দুর্জনকে আঘাত করতেও কোনো দ্বিধা না রাখার কথা বলছেন কবি। দুর্বলের পাশে বল হয়ে দাঁড়িয়ে যে মানবতার প্রকাশ মানুষ ঘটাবে সেখান থেকেই বিকশিত হবে বিশ্বমানবতার অঙ্কুর—

আমি ভয় করব না ভয় করব না।
দুবেলা মরার আগে মরব না, ভাই মরব না।।
তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে—
তাই ব'লে হাল ছেড়ে দিয়ে ধরব না, কান্নাকাটি ধরব না।।

তুফানকে ভয়না পেয়ে যারা তরী পারে নিয়েছেন সেই বীরপুরুষেরাই পৃথিবীর যা কিছু ভালো তা নিজের করতল গত করেছেন অনন্তকাল ধরে—

ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার।
হালের কাছে মাঝি আছে, করবে তরী পার।।

হিংসা, দ্বন্দ্ব, কুটিলতার পাশাপাশি হৃদয়বান মাঝি তার মানবিক দৃষ্টি নিয়ে চিরকাল অবস্থান করে। সে কারণেই এখনও সবকিছু প্রবহমান।

কেবল সাম্রাজ্যবাদ নয় শ্রমজীবী মানুষের শাশ্বত জীবনের জয়গান গেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। লিখেছেন— "শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে/ ওরা কাজ করে।" শুধু কবিতার পঙক্তি নয়—

আয়রে মোরা ফসল কাটি—
ফসল কাটি, ফসল কাটি।
মাঠ আমাদের মিতা ওরে, আজ তারি সওগাতে
মোদের ঘরের আঙণ সারা বছর ভরবে দিন রাতে।।

এমন অসংখ্য গানের কলি খুঁজে পাই শ্রমজীবী মানুষের জীবনগাথা। তিনি আমাদের-তোমাদের জন্য আসেননি। এসেছিলেন মানুষের জন্য। বিশ্বমানবের জন্য। শ্রমজীবী মানুষের জীবনগাথাই কেবল রচনা করেননি। স্বদেশের সংকটে, পৃথিবীর সংকটে, সভ্যতার সংকটে গানের মাধ্যমে তিনি উজ্জীবনী মন্ত্র দান করে গেছেন—"শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান/ সব দুর্বল সংশয় হোক্ অবসান।", "নিত্য নব সত্য তব/ শুভ্র আলোকময় পরিপূর্ণ জ্ঞানময়। কবে হবে বিভাসিত মম চিও আকাশে।", "বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল/ পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুন্য হউক, হে ভগবান।" বাংলার প্রতি তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম প্রকাশ পেয়েছে অসংখ্য গানে—

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।।"

"ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।"

"হে মোর চিত্ত, পুন্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।"

"আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!"

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে।"

অনেক গান তিনি তাঁর নাটকে ব্যবহার করেছেন। যার মধ্যে দিয়েও তাঁর জীবন ভাবনার একটা দিক দর্শন আমাদের সামনে উঠে আসে। সামান্য ছুঁয়ে দেখা যাক, হয়তো পরিপূর্ণতা আসতে পারে। 'রক্তকরবী' নাটকে রঞ্জন বলছে লাঙলের বদলে মাদল পেলে কাজের রশি খুলে দিতে পারে। সুরহীন সমাজের কুনোব্যাঙ রাজা। দাম্ভিক পৌরুষত্বের প্রতীক। তার যে সুর নেই তা নয় কিন্তু তার বাইরের যে খোলস সেটা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে সে ভয় পায়। এটাই সংকট। সভ্যতার সংকট। মানবতাবোধের সংকট। সমস্ত কিছু পেরিয়ে নাটকে সকলের সমবেত শ্রম সংগীত আমরা শুনি। এক সুরে ঐকতানের বাণী। একত্রিত হওয়া—

"পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয়রে চলে,
আয় আয় আয়।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি হায় হায় হায়।"

'অচলায়তন' নাটকে তিনি দ্বিধান্বিত। শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার পর তিনি ছাত্রদের মহড়া দিচ্ছেন, সেখানেও তিনি দ্বিধান্বিত কোথাও ছাত্রদের আবদ্ধ করে দিচ্ছেন না তো। স্থলভভূমির মত কোথাও স্থির হয়ে যাচ্ছে না তো তারা। পদ্মানদীকে তিনি ভীষণ ভালোবাসতেন। ভালোবাসতেন তার সর্বদা চলমান গতিশীলতার জন্য। তার মধ্যে দিয়ে তিনি একটা গতি, সুর, ছন্দ অনুভব করতেন। সে কারণে শান্তিনিকেতনকেও সে রকম গতিশীল করার ভাবনায় তিনি সক্রিয় থাকতেন সর্বদা। "ওরে গৃহবাসী খোল্, দ্বার খোল্, লাগল যে দোল।/ স্থলে জলে বনতলে লাগল যে দোল।/ দ্বার খোল্, দ্বার খোলা।।" পৃথিবীর সকল কিছুর মধ্যে দিয়ে তিনি বাঁচার কথা বলছেন। সবকিছুকে ছুঁয়ে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। মানুষ আর প্রকৃতিকে এক করে চলার কথা বলছেন।

তিনি গান লিখছেন, নাটকের জন্য গান লিখছেন, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্যের জন্য গান লিখছেন—সবের মধ্যে দিয়েই তিনি মানুষের সঙ্গে মানুষের, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের, বিশ্বের সঙ্গে মানুষের একটা যোগের কথা বলেছেন। গানের মধ্যে দিয়ে তিনি নিজেকে মুক্ত করছেন। 'শ্যামা', 'চণ্ডালিকা'য় মানুষে মানুষে ক্ষমতা বিধানের কথা বলছেন। উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ভুলে মানুষে মানুষে নতুন সম্পর্কের কথা বলেছেন, গানের মধ্যে দিয়ে তিনি সারা পৃথিবীর একটা সুর ও ছন্দ আমাদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন, তার এই বিস্তৃত গানের ভাণ্ডারে আমাদের স্নাত করিয়েছেন। কেবলমাত্র মানবপ্রীতি নয়, প্রকৃতি প্রীতি, স্বদেশপ্রীতি সকল ধরনের প্রীতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছেন।

তিনি তো দার্শনিক, পৃথিবীর মানুষের শান্তিপথের দিশারি হয়ে তাঁর আবির্ভাব। তাই আন্তর্জাতিক শান্তিবর্ষে (১৯৭৯) সমস্ত পৃথিবী তাঁর সঙ্গে গেয়ে উঠল—"স্বর তরঙ্গিয়া গাও বিহঙ্গম পূর্ব পশ্চিম বন্ধুসঙ্গম মৈত্রীবন্ধন পুণ্যমাত্র পবিত্র বিশ্ব সমাজে।" দেশে বিদেশে চারিদিকে যখন, স্বার্থ, দ্বন্দ্ব, দম্ভ, সংকট দেখি তখনই মনে হয়—

"হে নূতন,
দেখা দিক আর-বার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।
তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিকা করি উদঘাটন
সূর্যের মতন।"

ত থ্য সূ ত্র:

১) সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪০৬

২) পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্য পরিচয়*, তুলসী প্রকাশনী, ২০১৭

৩) *রবীন্দ্র প্রসঙ্গ*, সম্পাদনা ক্ষুদিরাম বসু, প্রথম সংস্করণ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গসরকার, ২৫ বৈশাখ ১৩৯৫

৪) *পশ্চিমবঙ্গ* পত্রিকার রবীন্দ্র সংখ্যা, ১৪০১, সম্পাদক সুখেন্দু দাস প্রমুখ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মে, ২০০৩

৫) *সংকলন*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৪১৯

৬) *শিক্ষারম্ভ, জীবনস্মৃতি*, রবীন্দ্র রচনাবলী সপ্তদশ খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, অগ্রহায়ণ ১৩৮৪

৭) *রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ*, ক্ষুদিরাম বসু প্রমুখ সম্পাদিত, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প.ব.সরকার, ২৫ বৈশাখ ১৩৯৫

৮) সুভাষ চৌধুরী, *কবিতা থেকে গান গীতবিতানের জগৎ*, প্যাপিরাস, সংযোজিত সংস্করণ, নভেম্বর ২০১৩

৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পুনর্মুদ্রণ, মাঘ ১৪২১, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ।

বর্তমানের উন্নয়নের সংকট-মুক্তির উপায় হিসেবে রবীন্দ্র-ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা

ড. মানিক মণ্ডল

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

বর্তমানে আধুনিকতার নামে আমরা যে বিপুল অবকাঠামো দাঁড় করিয়েছি, প্রকৃতির ক্ষতি করছি তাকে কিছুতেই উন্নয়নের সূচক বলা চলে না। প্রকৃতির ক্ষতিকে প্রবৃদ্ধির সূচকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চাইলেই আমাদের সনাতনী জীবনচলা, ভোগের আকাঙ্ক্ষা ও ধরন, প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পদ আহরণের পথ ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত বৈষম্যের বিকাশ ইত্যাদি বিষয়ে নতুন প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক। এ-সব প্রশ্নের আলোকে আবার আমরা জীবনকে নতুনভাবে সাজাতে পারি। জীবনবোধকে নতুন ভাবনার রূপরেখায় সাজাতে পারি। ভোগ, বিনিয়োগ ও সঞ্চয়কে নতুন উপলব্ধির আলোকে অন্যভাবে গ্রহণ করতে পারি। চারপাশের পরিবেশ ও আগামী প্রজন্মের চাহিদাকে এসব উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত করতে পারি। এভাবে জীবনকে অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে যুক্ত করে দেখার এই যে অভিপ্রায় তা থেকেই বের হয়ে আসবে সংস্কৃতির নতুন রূপ। খুঁজে পাব জীবনে চলার মর্ম। অনুভব করতে পারব সীমার মাঝেও অসীমের স্পন্দন। রবীন্দ্রনাথ দারুণ আত্মবিশ্বাসী ছিলেন বলেই এমন করে বলতে পেরেছিলেন যে, বিমর্ষতার সঙ্গে মাখামাখির পরিণতি হয় নিজের ওপর আস্থা হারানোর এক বন্দীদশায় আত্মসমর্পণ। আজীবন তিনি একটি সুস্থ সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন। বড়ো কিছু আশা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে যে সমাজ, নির্ঘাত তার বাঁচার সব পথই বন্ধ। তবে সাধারণ মানুষ খুব বেশি দূরের স্বপ্ন দেখতে পারেন না। জীবনচলার নানা সংগ্রামে তাঁরা এতোই মগ্ন থাকেন যে 'দিন এনে দিন খাই' চিন্তার বাইরে তাঁদের পক্ষে বিচরণ করা খুবই মুশকিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনচর্চায় সংকটের সময়ও স্বপ্নের নিরিখে বাস্তবতার আদলে নিরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতেন, আমরাও আজ দেশের সংকটের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের মতো আত্মবিশ্বাসী হয়ে আমাদের সমস্ত আয়োজনকে সার্থক করে করে তুলতে চাই। চারদিকের এই সংকটের অবস্থা সত্ত্বেও আমরা আশাবাদী হতে চাই। নতুন সময়ের প্রত্যাশা করতে চাই।

বর্তমানে আমরা প্রতিদিনের যান্ত্রিকতা ও অসহযোগিতার মাধ্যমে আত্মহননের যে পথ বেছে নিয়েছি, তার মাধ্যমে নতুন শতাব্দীর ও সম্ভাবনাময় দিকগুলোর কথা আমাদের চিন্তা ও চেতনাতেই আনতে পারছি না। এসবের নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে সমাজে, সংস্কৃতিতে। ফলে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত হবার জন্য সামনে যে ভরসায় পরিবেশ তৈরি করা দরকার—সে বিষয়টিই যেন ভুলতে বসেছি।

তারপরেও বুক বেঁধে রয়েছি ইতিবাচক পরিবর্তনের আশায়। আশা করছি যে একসময় নিশ্চই নেতৃবর্গ নতুন শতাব্দীর এই নতুন দায়িত্বের মর্ম বুঝতে পারবেন এবং সেই মতো কর্ম পরিকল্পনায় ঝাঁপিয়ে পড়বেন। পালাবদলের এই ক্রান্তিকালে তাঁদের রবীন্দ্র-ভাবনায় অবগাহন করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের কথা নিঃসন্দেহে আমাদের মন কাড়ে। কিন্তু সমাজ ও অর্থনীতির ওপর হালে কালের যে আঁচড় পড়েছে তার মর্মও বুঝতে হলে রবীন্দ্রনাথের সামাজিক ও সংস্কৃতির চিন্তামূলক প্রবন্ধগুলো অবশ্য পড়তে হবে। সমকালীন উন্নয়ন-ভাবনায় নতুন মাত্রা যোগ করার জন্যে রবীন্দ্রনাথ আজও তাই খুবই প্রাসঙ্গিক।

যদিও ইতিমধ্যেই আমাদের অনেক অর্জন ও সাফল্য হারিয়ে যাবার পথে, তবুও বলা চলে এখনও

আমরা নিজেদের ঐতিহ্য ও ইতিহাসের দিকে তাকাতে পারি। আমরা নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তিক অর্জনের দিকে নজর দিতে পারি। আর সেখানে রবীন্দ্রনাথের উন্নয়ন-মূলক চিন্তাচেতনা বিরাট এক শক্তির আধার হিসেবে বের হ'য়ে আসতে পারে। অনেকেই রবীন্দ্রনাথকে শুধুই একজন রোমান্টিক কবি হিসেবে ভাবতে অভ্যস্ত। কিন্তু আজকের উন্নয়ন-সংকটের পরিবেশে দাঁড়িয়ে যদি বলি, রবীন্দ্রনাথের আর্থ-সামাজিক অনেক ভাবনা হতে পারে আমাদের স্বকীয় পথ চলার সহায়ক শক্তি, তাহলে আঁতকে ওঠার কোনো কারণ নেই। রবীন্দ্রভাবনায় এমন সব তাত্ত্বিক সূত্র গ্রথিত রয়েছে, যেগুলো আধুনিক তো বটেই, অনাগত ভবিষ্যতের জন্যেও প্রযোজ্য হ'তে পারে। সেজন্যে অনেকেই এখন রবীন্দ্রনাথকে 'পোস্টমর্ডানিস্ট' বলতেও দ্বিধা করছেন না। রবীন্দ্রনাথের বিপুল বুদ্ধি-বৃত্তিক বিশ্লেষণ ও বাস্তব কর্মকাণ্ডের খোঁজ করলে আমরা বিস্ময়কর সব সম্ভাবনা লক্ষ করি।

নিঃসন্দেহে সময় বদলে গেছে। বর্তমানে আরো দ্রুত বদলাচ্ছে। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ দিন দিনই প্রাসঙ্গিক হ'য়ে উঠছেন। সেই পরনির্ভরতা, আত্মশক্তির প্রতি অনাস্থা, মানসিক স্বাধীনতার অভাব, আত্মসম্মানের ঘাটতি, অনুকরণের বাতিক সব কিছুই আজো সমান তলে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিকে বিপর্যস্ত করছে। সেদিনের চেয়ে আজকের আগ্রাসন আরো প্রবল। এমন সংকটময় পরিস্থিতিতে আমরা নিজেদের প্রয়োজনেই ফিরে যেতে পারি রবীন্দ্রনাথে। তাঁর উন্নয়ন ও পরিবেশ চিন্তা আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক নতুন পথেরও সন্ধান দিতে পারে।

দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথমে দেশীয় সম্ভাবনা ও পদ্ধতিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কেন-না, শক্ত পায়ে না দাঁড়ালে বাইরের হাওয়া সহজেই উপড়ে ফেলতে পারে। তাই বলে ঘরের দুয়ার বন্ধও করতে চান না রবীন্দ্রনাথ। কেন না বাইরের আলো-বাতাস না পেলে কোনো গাছই শক্ত সামর্থভাবে গড়ে উঠতে পারে না। 'ভারতবর্ষীয় সমাজ', 'পল্লী প্রকৃতি', 'আত্মশক্তি' 'সমবায়নীতি' প্রতিটি ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ এই 'ঘরে বাইরের' সমন্বয়ের ওপর জোর দিয়েছেন। কাজেই উল্টো পল্লী সঞ্চালন, পল্লীর আত্মীয়তা, সৃজনশীলতা তাঁর আরাধ্য। আত্মশক্তির সন্ধানে তিনি এভাবে নিজের শক্তির ওপর দাঁড়িয়ে বাইরের শক্তির সঙ্গে বোঝাপড়ার তাগিদ দিয়েছেন।

রবীন্দ্রভাবনায় মানুষ ও পুঁজি দুই-ই গুরুত্ব পেয়েছে। তবে সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে সাম্যচিন্তা। তিনি ধনার্জনের বিরুদ্ধে ছিলেন না। তবে তাঁর মতে ধনার্জনের ওপরও থাকতে হবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ধনকে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে বন্দী করার বিরোধী ছিলেন তিনি। তবে জোর ক'রে ধনকে কেড়ে নেবারও বিপক্ষে ছিলেন তিনি।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই সাম্য অর্জনের লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ সমবায় ভাবনার প্রবলভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। আয়ারল্যান্ডসহ ইউরোপের অনেক দেশের সমবায় আন্দোলনের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

প্রকৃতির ওপর ব্যভিচার করে আজকের দুনিয়ায় যেভাবে উন্নয়নের জোরজবরদস্তি চলছে সে কথা মনে রেখেই খুব সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ বহু আগেই লিখেছিলেন:

"আমরা লোভবশত প্রকৃতির প্রতি ব্যভিচার যেন না করি। আমাদের ধর্মে-কর্মে, ভাবে-ভঙ্গিতে প্রত্যহই তাহা করিতেছি এইজন্য আমাদের সমস্যা উত্তরোত্তর জটিল হইয়া উঠিতেছে আমরা কেবলই অকৃতকার্য এবং ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িতেছি। বস্তুত জটিলতা আমাদের দেশের ধর্ম নহে। উপকররের বিরলতা জীবনযাত্রার সরলতা আমাদের দেশের নিজস্ব এইখানেই আমাদের বল, আমাদের প্রাণ, আমাদের প্রতিভা।"[১]

ভাবতে অবাক লাগে কতো আগে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ ঘনিয়ে আসা 'সভ্যতার সংকটে'র কথা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। মূলত অর্থনৈতিক বৈষম্য, শক্তিবানের দাপট এবং নৈতিকতা বিবর্জিত লক্ষ্যহীন শক্তির বিকাশে যে মুক্তি নেই সে কথাটি আজ যেমন সত্যি বলে মনে হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের সময়ে তা ততোটা স্পষ্ট হবার কথা নয়। কিন্তু তিনি তার পূর্বাভাস পেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা-ভাবনায়, পরিবেশ-ভাবনায় বারবার গুরুত্ব দিয়েছেন দেশকে জানার জন্য, ইতিহাসকে

জানার জন্য, পূর্ব-পুরুষদের অর্জনকে বোঝার জন্য। সচেষ্ট মানুষই পারে নিজের ভাগ্যকে নিজের মতো করে গড়তে। সৃজনশীলতার আনন্দ, নিজের পরিবেশকে আনন্দ ও প্রেমের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে ও নিত্যসঙ্গী ভাবার মতো মন ও চোখ রবীন্দ্রনাথের ছিল। সে-জন্য তিনি মানুষের শুষ্ক মনকেই বেশি করে দায়ী করেছেন পরনির্ভরতার জন্যে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি মানুষকে সমস্যার মূলে যাবার তাগিদ দিয়েছেন। খণ্ড খণ্ড করে সমস্যাকে দেখতে বারণ করেছেন। তিনি বলেছেন:

"বাইরে থেকে একটা অভাবের তালিকা প্রস্তুত করে দেখা, সমস্যাকে খণ্ড করে দেখা। যে মূলের থেকে তারা সকল অভাব শাখায় প্রশাখায় ছড়াচ্ছে, সে হচ্ছে প্রতিহত চিত্তধারার শুষ্কতা। মানুষের চিত্ত যেখানে সবল থাকে সেখানে সে আপনার নিহিতার্থকে আপন শক্তির যোগে উদ্বোধিত করে। তার থেকে সে যা-কিছু ফল পায়, সে ফল তত মূল্যবান নয়—যেমন মূল্যবান তার এই সচেষ্ট আত্মশক্তির উপলব্ধি। এতেই তার সকলের চেয়ে বড়ো আনন্দ, কেননা মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো পরিচয় হচ্ছে সে সৃষ্টিকর্তা।"[২]

রবীন্দ্রনাথ শুধু এমন মৌলিকভাবে ভেবেই ক্ষান্ত হননি। তিনি নিজে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। 'শান্তি নিকেতন', 'শ্রীনিকেতন', 'গ্রামীণ ব্যাংক' ইত্যাদি নানা উদ্যোগ তাঁর ঐ-সব মৌলিক ভাবনার প্রায়োগিক প্রচেষ্টার উদাহরণ। পরিশেষে বলা যায় যে, আধুনিক বিশ্বের জ্ঞান-গরিমাকে সমালোচনাসহ গ্রহণ করেও আমরা আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য চিন্তায় যে গণতান্ত্রিকতা, বিকেন্দ্রায়ন, সমাজনির্ভরতা, আত্মীয়তা, আত্মসম্মান ও জাতীয়-চেতনা বহন করে চলেছি সেসব ধারণাকে আমাদের উন্নয়ন-ভাবনার ফ্রেমে যুক্ত করতে পারি। আর এভাবে নিশ্চিতভাবেই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলী ও বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ফিরে যেতে পারি। আশা করি, নিজেদের এই যাবতীয়য় সংকট থেকে মুক্তির জন্য দ্রুত এ কাজটি করতে পারলে আমরা বাঁচার পথ খুঁজে পাবো।

তথ্য সূত্র:

১) 'আত্মশক্তি', রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১২৫তম জন্ম-জয়ন্তী সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০
২) 'পল্লীপ্রকৃতি', তদেব, পৃ. ৭৭১।

নারীর আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ শিবির

What IT jobs are available now for college graduates?

Sandip Tigga

Assistant Professor, Department of Computer Science

Introduction: The IT industry continues to be a robust sector offering diverse opportunities for graduates from various disciplines. This document analyzes the current job market for BA, BSc, B.Com, and BBA graduates, highlighting key roles, trends, and preparation tips.

A. Opportunities for BSc Graduates:

1. Software Developer

Role: Developing and maintaining software applications.

Skills Required: Programming languages (Java, Python), problem-solving, software development lifecycle.

Demand: High, with a focus on innovative solutions and application development.

2. Data Scientist

Role: Analyzing and interpreting complex data to aid decision-making.

Skills Required: Statistical analysis, machine learning, data visualization.

Demand: Growing, especially in sectors like finance, healthcare, and e-commerce.

3. Machine Learning Engineer

Role: Developing algorithms that enable machines to learn from data.

Skills Required: Machine learning frameworks (TensorFlow, PyTorch), programming, data analysis.

Demand: Increasing, with applications in AI, automation, and predictive analytics.

4. Web Developer

Role: Building and maintaining websites.

Skills Required: HTML, CSS, JavaScript, responsive design.

Demand: Consistent, with a focus on user experience and mobile compatibility.

5. Cyber Security Analyst

Role: Protecting systems and networks from cyber threats.

Skills Required: Network security, risk assessment, incident response.

Demand: High, due to the increasing number of cyber threats.

B. Opportunities for BA, B.Com, and BBA Graduates:

1. System and Application Services Associate

Role: Application development, low-code platforms, test automation.

Skills Required: Basic programming, application testing, problem-solving.

Demand: Growing, with companies like Accenture offering entry-level positions.

2. IT Consultant

Role: Advising businesses on IT strategies to meet their goals.

Skills Required: Business analysis, IT knowledge, communication.

Demand: Steady, with a focus on digital transformation.

3. Project Manager

Role: Overseeing IT projects from inception to completion.

Skills Required: Project management, leadership, communication.

Demand: High, especially for those with PMP certification.

4. Business Analyst

Role: Analyzing business needs and translating them into IT solutions.

Skills Required: Analytical thinking, IT knowledge, communication.

Demand: Consistent, with a focus on improving business processes.

5. Digital Marketing Specialist

Role: Enhancing online marketing efforts using IT tools.

Skills Required: SEO, content marketing, data analysis.

Demand: Increasing, with the rise of digital marketing.

General Trends

Remote Work: Many IT roles now offer remote work options, providing flexibility.

Up Skilling: Continuous learning and certifications in new technologies (like cloud computing, AI, and cyber security) are highly valued.

Internships and Entry-Level Positions: Companies like Accenture offer entry-level positions for fresh graduates, providing a good start to their careers.

Flow Diagram: Improving your chances of landing an entry-level IT job involves a combination of skill development, networking, and strategic job searching. Here are some tips to help you stand out:

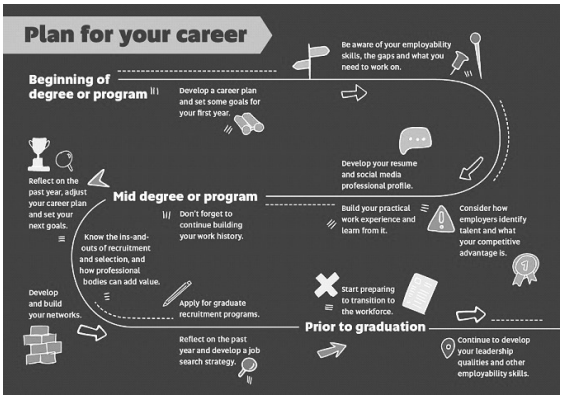

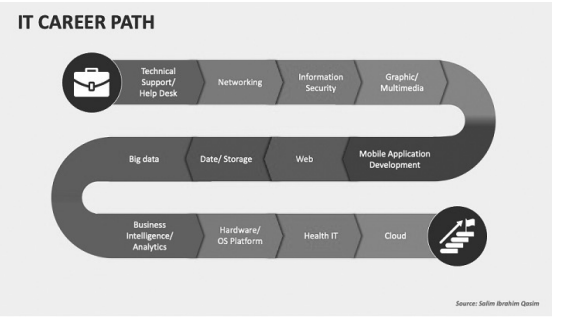

1. Build Relevant Skills

Learn Programming Languages: Familiarize yourself with popular languages like Python, Java, or JavaScript.

Get Certified: Certifications like Comp TIA A+, Google IT Support, or AWS Certified

Solutions Architect can boost your resume.

Develop Soft Skills: Communication, problem-solving, and teamwork are crucial in IT roles.

2. Gain Practical Experience

Internships: Look for internships or part-time jobs in IT to gain hands-on experience.

Projects: Work on personal or open-source projects to showcase your skills.

Freelancing: Take on freelance projects to build your portfolio.

3. Network

Join Professional Groups: Participate in IT-related groups on LinkedIn or local meatus.

Attend Conferences and Workshops: These events are great for learning and networking.

Connect with Alumni: Reach out to alumni from your college who are working in IT.

4. Tailor Your Resume and Cover Letter

Highlight Relevant Skills: Focus on skills and experiences that match the job description.

Use Keywords: Incorporate keywords from the job posting to pass through applicant tracking systems.

Showcase Projects: Include links to your Git Hub or portfolio to demonstrate your work.

5. Prepare for Interviews

Practice Common Questions: Be ready to answer technical and behavioral questions.

Mock Interviews: Conduct mock interviews with friends or mentors to build confidence.

Research the Company: Understand the company's products, services, and culture.

6. Stay Updated

Follow Industry Trends: Keep up with the latest trends and technologies in IT.

Continuous Learning: Take online courses or attend workshops to keep your skills current.

7. Utilize Job Portals

Job Boards: Use platforms like LinkedIn, Indeed, and Glass door to find job openings.

Company Websites: Check the career pages of companies you're interested in.

Recruitment Agencies: Consider working with agencies that specialize in IT placements.

You'll be well-prepared to secure an entry-level IT job by focusing on these areas.

Conclusion: The IT sector offers a wealth of opportunities for graduates from various disciplines. By focusing on relevant skills and continuous learning, graduates can secure rewarding careers in this dynamic field.

"আজকের বাংলাদেশের অজস্র বকুল-পারুলদের পিছনে রয়েছে অনেক বছরের সংগ্রামের ইতিহাস। বকুল-পারুলদের মা দিদিমা, পিতামহী আর প্রপিতামহীদের সংগ্রামের ইতিহাস।"

—আশাপূর্ণা দেবী

Human Values are the Pursuit of Happiness

Sunita Saha

Assistant Professor, Department of Commerce

"Happiness will never come to those who fail to appreciate what they already have"
—Gautam Buddha

"Happiness is not having a lot, Happiness is giving a lot"
—Gautam Buddha

The pursuit of "Happiness" is the fundamental goal of any human life. Human beings strive hard and dedicate themselves towards their "work" either physical or mental, in order to achieve a purpose and have the hope to enjoy happiness. Happiness can be explained as a state of mind filled with joy, positive emotions and attainment of desired dreams that lead towards a meaningful life. Happiness isn't a constant state of mind but it is an overall sense of experiencing positive emotions more rather than negative, there are some signs of happiness, like feeling that we are living a satisfied life, practising self-care and treating ourselves with kindness and been compassionate with self, feeling accomplished with the views what we wanted in your life. These forms of happiness are personal which we try to attain to lead a healthy, wealthy and respectful life. But self-happiness may not always bring peace of mind.

Sometimes 'Happiness' is generally backed by sorrow. If we are happy today, we may be sorrowful tomorrow. Happiness is derived from pleasure, which arises from not only self-care & self-love, but it is also associated with fulfilling responsibilities towards welfare of others sacrificing own personal needs. Building up of "Human Values" is very essential among people of all generations. Increased importance towards human values increases resilience. Resilience helps people to manage stress and combat with the setbacks. Swamiji has indicated some beautiful forms of work identified as 'service' to own self and the Nation. The major point he has highlighted in 'service' is to consider 'work as worship' and not to develop a passion towards 'work and worship' separately. He has given a simple equation to explain 'service'

Man (Jiva) = God (Shiva)

How to be a Happier Person: Strong Social Relationship is a strong predictor to cultivate happiness. Swamiji has tried to inculcate among all a feeling of "selflessness" for any kind of service work. The spirit of selfless service with utmost care, love and compassion among common man shall ignite a feeling towards achieving a social goal. Two opposing forces exists among all human beings, 'Aham' (myself) and 'Naham' (Not myself), the former

reflects our selfish attitude and the latter signifies selfless attitude. Swamiji believed that selfishness can be reduced to a large extent through the realisation of 'spiritual dimension of human personality' and there arises the importance of 'Practical Vedanta'. The essence of Vedanta teaches that Man should have faith in themselves with the purpose of attaining divinity. Swamiji has explained that each soul is divine and the manifestation for attaining divinity can be done by work, worship, self-control, self-realisation. He also explained the idea of Vedanta as oneness. He said there is one life, one world, one existence and everything is one.

One can practice different ways to become a happier person. Two of the common form has been discussed hereby:

"Team Work" is a powerful concept that can energises us towards achieving a common purpose and that shall help us to tackle various challenges in different spheres of life. Strong association among team members can resolve problematic scenarios and can help us to combat with stressful environment. Teamwork offers positive synergies:

1. High level of engagement towards any kind of social, economic, political, cultural, technical, academic work increases strong connections among peers which builds a positive work culture.

2. When we are working in a team it provides us the benefit of multiple strengths. Everyone's strength removes the weakness. Diverse range of skills and knowledge together creates a creative and innovation endeavours.

3. Developing an environment of accountability towards accomplishing a work within a particular time frame. It may be seen sometimes that if we work alone then we may fail to complete the work within a specified time, but supportive work culture pulls us to achieve the target that also reduces the level of stress.

If you are looking for better performance, then "Team Support" can help us in resolving disputes and several talented minds together will result in better performance.

Another form of practicing the method for attainment of happiness can be

"Daridranarayana", the word has been coined by Swamiji. 'God in the form of poor', and he told us to serve the poor. In other words, he said "Where should you go to seek God—are not all the poor, the miserable, the weak, Gods? Why not worship them first". His major plan of action was eradication of mass poverty. The Nobel Laureate Amartya Sen also stated in his research works that adequate income generating assets, food, shelter, basic education, health care determines the capabilities of anyone in the society. He emphasised that economic development of the society is more important for which self confidence, self reliance, self respect is very important which is the primary factor for removing the miseries in life. We must work hard for bringing up community development programs.

At the end, I would like to conclude by the report of a Journalist, (Mazumdar.J, The Telegraph, 16/2/2024), the practice of which can make us happy. There she has left a message for

parents and their children that sports, music and other extracurricular activities must not been given up by the students before exams. In that report a psychiatrist has explained that physical and extracurricular activities release positive chemicals (endorphins) in the body and helps to improve the physical and mental state of a child.

We must earnestly try to propagate the ideologies of Swamiji at different levels to make social, economic development of Self and the Nation. Human values must be cultivated so that the ultimate meaning of Happiness can be understood.

References:

1. Importance of the Service Sector in India: Relevance of Swamiji's Vision, Dr. Debashis Mazumdar, Retd. Associate Professor, Dept. Of Economics, Bangabasi College, ISBN 978-81-923645-4-4

2. Medda. G, 'Swamiji's Concept of Practical Vedanta', Anudhyan An International Journal of Social Sciences (AIJSS)

শিক্ষার্থীদের যোগব্যাম প্রদর্শন

I-DOC: Revolutionizing Healthcare with AI-Powered Disease Prediction

Sk Md Abidar Rahaman

Faculty of Computer Science Department

In the realm of healthcare, timely diagnosis and effective treatment are crucial for saving lives. However, the complexity of symptoms and the vast array of possible diseases often pose significant challenges for medical professionals. To address this issue, a team of innovative students from the Computer Science department of Tarakeswar Degree College has developed an AI-based application called I-DOC. This AI-based application can predict diseases based on given symptoms and suggest remedies.

I-DOC leverages the power of artificial intelligence and machine learning algorithms to analyze symptoms and provide accurate diagnoses. The application's intuitive interface allows users to input their symptoms, which are then processed by the AI engine. This engine is trained on a vast dataset of medical information, enabling it to identify patterns and correlations between symptoms and diseases.

One of the most significant advantages of I-DOC is its ability to provide personalized recommendations for treatment. Based on the predicted disease, the application suggests relevant remedies, including medications, lifestyle changes, and dietary modifications. This feature empowers users to take proactive steps towards managing their health and seeking medical attention when necessary.

The development of I-DOC is a testament to the ingenuity and creativity of the students involved. By harnessing the potential of artificial intelligence and machine learning, they have created an application that has the potential to transform the way we approach healthcare. I-DOC is a valuable resource for individuals seeking to take control of their health.

In conclusion, I-DOC is a pioneering AI-based application that is poised to revolutionize personal health. By providing accurate disease predictions and personalized treatment recommendations, I-DOC has the potential to improve health outcomes, enhance patient care, and empower individuals to take charge of their well-being. The students of the computer science department of Tarakeswar Degree College have truly made a remarkable contribution, and their innovative spirit is an inspiration to us all.

নীতি ও আইনের পাঠ: ছেলেবেলার কিছু ভালোলাগা বই

ড. হিমাদ্রি মণ্ডল

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

শিশুর মন রীতি-নীতির ধার ধারে না। জীবনের জটিলতা, সামাজিক শাসনের বন্ধন সে মানতে চায় না। তার কল্পনাবিলাসী, নির্জটিল, ফুলের পাপড়ির মতো পেলব মন যখন যা চায় তাই করতে ভালোবাসে। তার মন এই মুহূর্তে খেলনার প্রতি আকৃষ্ট হয় তো, পরমুহূর্তে তা খেলনা ফেলে চলে যায় প্রজাপতি কিংবা ফুলের দিকে। কিংবা আকাশের ঘুড়ির সঙ্গী হয়ে ডানা মেলে নীল দিগন্তে। তার বয়সি কারো হাতের খেলনা বা আইসক্রিম কেড়ে নিলে আমরা 'প্রবীণ', 'পরম পাকা'রা যতই বিচলিত হই না কেন কিংবা চোখ রাঙিয়ে তাকে শাসন করি না কেন আমাদের কিন্তু ভাবতে হবে এই বয়সটা একদিন আমদেরও ছিল। হয়ত আমরাও বাবা-মার মাথা হেঁট করিয়েছিলাম অন্যের কাছে এই ধরনের 'মহৎ কীর্তি' করে। ছোটোবেলায় যে আচরণ আদরের, ক্ষমার প্রাপ্তবয়সে তা লজ্জার, ঘৃণার। কখনও বা পরিহাসের কিংবা মানহানির। একটা শিশুকে তার পরবর্তী জীবনের পাঠ দেওয়া শুরু হয় তার শৈশব থেকেই। কারণ মাটি শক্ত হয়ে গেলে তা দিয়ে প্রতিমা গড়া যায় না। সেজন্য ছোটোবেলা থেকে শিশুদের সামাজিক আদর্শের পথগুলি চিনিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলে। বড়ো হয়ে যাতে তারা বিপথগামী না হয়। কারণ আজকের শিশুই তো পরবর্তী কালের নাগরিক। সমাজ, রাষ্ট্র, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। তাদের রঙেই রঙিন হবে আগত দিনের সূর্য। ছেলেবেলা থেকে তাই গোপাল, রামদের আদর্শে তাদের বড়ো করে তোলার চেষ্টা চলতে থাকে। রাখাল, মাধব, ভুবন-রা যাতে শিশু মনের একশ যোজনের ভিতরেও না আসতে পারে সে চেষ্টা করে প্রায় প্রত্যেক মা-বাবা, আত্মীয়-পরিজন (ব্যতিক্রম থাকবে, সেটি পৃথিবীর নিয়ম)।[১]

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। শুধু নিজের জন্য সে বাঁচে না। অন্যের জন্যেও তার পৃথিবীতে বেঁচে থাকা, টিকে থাকা। নিজেদের জীবন, সমাজ, পৃথিবীকে আরো সুন্দর, মনুষ্যবাসের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার দায়িত্ব প্রকৃতি চাপিয়েছে মানুষের কাঁধে। নিজেকে, সমাজকে, পৃথিবীকে আগের অবস্থা থেকে আরো ভালো করে গড়ে তোলার ভাবনাটাই মানুষকে পৃথক করেছে অন্যান্য প্রাণী থেকে। শুধু নিজের জীবন নয় অন্যের জীবনও যাতে সুন্দর, সুস্থ, অনর্গল হয় সে জন্যই আমরা নির্ধারণ করেছি রীতি, নীতি, আইনের। সমাজকে একটা শৃঙ্খলায় পরিপাটি করে রাখাই এগুলির কাজ।

'রীতি', 'নীতি' ও 'আইন'—এই তিনটি শব্দের সঙ্গে আমাদের সকলেরই কমবেশি পরিচয় রয়েছে। তবু প্রবন্ধের খাতিরে বিষয়গুলি সম্পর্কে দু-চার কথা বলা প্রয়োজন। 'রীতি' বলতে আচারপরম্পরা, ব্যবহারক্রমকে বোঝায়।[২] পারিবারিক রীতি, সামাজিক রীতি এগুলি সব সমাজে সমান হয় না। জাতি, গোষ্ঠী, পৃথিবীর প্রান্ত অনুযায়ী এটির পরিবর্তন ঘটে। রীতির সঙ্গে ঐতিহ্যের যোগ রয়েছে। সংস্কারের ধারণার সঙ্গেও রয়েছে কিছুটা মিল। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে পূর্বের রীতিকে ভ্রান্ত মনে হতে পারে। চলে আসা রীতির পরিবর্তে আমরা দাঁড় করাতে পারি নতুন রীতির। রীতির সঙ্গে প্রাচীনপন্থী ভাবনাও যুক্ত থাকতে পারে। হিন্দুদের বিয়ের আচার পদ্ধতি, পূজার আচার; মুসলিমদের বিয়ের নিয়ম, নামাজ; খ্রিস্টানদের প্রার্থনা পদ্ধতি ইত্যাদি রীতির উদাহরণ।

'নীতি'ও রীতির মতো ঐতিহ্যবাহী হতে পারে। আবার অবস্থা অনুযায়ী নীতির পরিবর্তন ঘটতে পারে। 'situational ethics' বা অবস্থা অনুসারী নীতি একটি চর্চিত বিষয়। নীতির সঙ্গে আদর্শের, শুভ, কল্যাণের ধারণা যুক্ত। রীতির মধ্যে যা থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। ব্যক্তি ভেদে, যুগ ভেদে, সমাজ ভেদে নীতির ধারণা

পরিবর্তিত হয়। বড়োদের সম্মান করা, বৃদ্ধ বয়সে মা-বাবাকে সেবা যত্ন, দুঃস্থ, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো এগুলি নীতির পর্যায়ভুক্ত। কেউ যদি রীতি বা নীতি না মানে তাহলে তার জন্য কোনো আইন বা শাস্তির বিধান করা যায় না। সে অন্যায় করেছে এমনও বলা যাবে না। বড়োজোর সমাজের চোখে সে খারাপ প্রতিপন্ন হতে পারে। কিন্তু কেউ আইন বা নিয়ম লঙ্ঘন করলে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। আইনের চোখে সব অপরাধী সমান। শাস্তিও সবার জন্য সমান ভাবে নির্ধারিত (মানা হয় না সেটা আইনের ত্রুটি, শাসন ব্যবস্থার গলদ)। অবশ্য আইনকে নীতি প্রভাবিত করতে পারে। ধরা যাক বিখ্যাত 'দি নেকলেস' গল্পটির ঘটনা সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে দিন আনা দিন খাওয়া কোনো পরিবারের ক্ষেত্রে। নকল নয় সত্যিকারের মূল্যবান হারটি চেয়ে এনেছিল তারা। সেটি চুরি হয়ে গেল। তাহলে কি বিচারক তাকে এই অপরাধের জন্য যে শাস্তি লিপিবদ্ধ আছে সেই শাস্তি দেবেন? মনে হয় না। কিংবা যিনি ধার দিয়েছিলেন তিনিও মনে হয় কিছুটা হলেও বিষয়টা ক্ষমা, মানবিক দৃষ্টি থেকে দেখবেন(যদি তিনি মানবিক হন)।

কিন্তু কেউ চাইল আর কাউকে মারধর করল বা কারো জিনিস সে জোর করে নিয়ে চলে এল বা দখল করে বসল এগুলি আইনের চোখে ছাড় পাবে না। আমার স্বচ্ছল অবস্থা, আমি সুস্থ ব্যক্তি তবুও লোকের কাছে ভিক্ষার জন্য আমি হাত পাতি এটি নীতির প্রশ্ন। কিন্তু আমি বিলাস বহুল বাড়িতে থাকি, দামি গাড়িতে (প্রতিটা একটি নয়, অনেক কটি) চড়ি অথচ সরকারি টাকা আত্মসাৎ করে আমি বিদেশে পালিয়ে গেলাম এটি আইনের আওতায় পড়বে। একসময় যা ছিল নীতি তা পরবর্তীতে আইনে পরিণত হতে পারে। যেমন সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে বৃদ্ধ মাতা-পিতার প্রতি ছেলে-মেয়ের অসৌজন্যমূলক ব্যবহার আইনি স্বীকৃতি পেয়েছে। একসময় এটি ছিল নীতির বিষয়। পৃথিবীর আদিম সমাজে আইন ছিল না, ছিল নীতি। পরবর্তীকালে বহু নীতি আইনের রূপ পেয়েছে। নীতি ও আইনের পারস্পরিক যোগসূত্র বহু দিনের।

(২)

প্রবন্ধে আলোচনার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে *বর্ণ পরিচয়* প্রথম ভাগ[৩] ও দ্বিতীয় ভাগ[৪], *ঠাকুমার ঝুলি*[৫] *টুনটুনির বই*[৬] এই চারটি বইকে। অবশ্য প্রথম দুটি গ্রন্থ মানুষের বর্ণ শেখার সময়কার হওয়ায় সেইসময় শিশুদের বাচ্চাদের কাছে বিরূপতারও কারণ হয়। আমাদের বাল্য, কৈশোরের (হয়ত এখনও) অলস দুপুর কিংবা ছুটির দিন ভরিয়ে রাখত এই বইগুলি। শুধু গল্প নয়, বই-এর ছবিগুলিও আমাদের মনকে মাতিয়ে রাখতো। এক অদ্ভুত আকর্ষণ রয়েছে বইগুলির। না হলে আমার চারপাশের অনেক বাচ্ছাকেই দেখি যাদের পরীক্ষার সময়ও বই খুঁজে পাওয়া যায় না, স্কুলের বই পড়তে চায় না তারাও এই বইগুলির কোনোটা পেলে ছেড়ে আর উঠতে চায় না (প্রাবন্ধিকের শৈশব জীবনের পড়ার ইতিহাস সন্ধান করে পাঠক প্রাবন্ধিককে লজ্জা দেবেন না এ বিশ্বাস পাঠনিষ্ঠ পাঠকের প্রতি রাখা যায়)।

টিভি, ইউটিউবে কার্টুনের রমরমা। কিড়িং কিড়িং বস্তুটা (মোবাইল) সকলের পকেটে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার এই বস্তুটি 'আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ' অপেক্ষাও বিস্ময়ের! এখানে এক লহমায় আপনি পেতে পারেন আপনার রুচি অনুসারী যে-কোনো প্রকার বিনোদনের উপাদান। আঙুলের সামান্য ছোঁয়াতে বদলে যাচ্ছে হরেকরকমের দৃশ্য! পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্ত এখন আপনার চোখের সামনে। যৌথ বিনোদনের রাজপথ ছেড়ে আমরা সকলে নিজের নিজের গলি পথে পা বাড়াচ্ছি। শুধু আমি, আপনি নন সঙ্গে আমার, আপনার আত্মজও। আপনার শিশু মোবাইল, কম্পিউটার, ল্যাপটপে গেম খেলে নিচ্ছে মাঠে খেলার আনন্দ। খাওয়ার সময় মোবাইলে ভিডিও বা গেম না চালালে আজ আর বহু শিশু খেতেই চায় না। ঠাকুমা, দিদিমারা যারা এঁদের পিছনে সময় দিতে পারত তারা আপনার সংকীর্ণ ফ্ল্যাটে জায়গা না পেয়ে কবেই বৃদ্ধাশ্রমে কিংবা গ্রামের বাড়িতে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। যৌথ পরিবার জীবন ভেঙে আজ নিউকিলিয়ার ফ্যামিলি আমাদের। বাবা-মা দুজনেই কর্ম ব্যাস্ত। অর্থ উপার্জনের নেশায় তারা ছুটেই চলেছে।

এমন এক সময়ে দাঁড়িয়ে হয়তবা এই বইগুলির জনপ্রিয়তায় সামান্য ভাটা পড়ছে এমনটা অনুমান করাই যায়। তবু বাংলার শিশু কিশোরদের মন জয়ে এই বইগুলির জুড়ি মেলা ভার (মতটি লেখকের একান্ত ব্যক্তিগত, কারো মত এর বিপরীত হতেই পারে)। কিন্তু আজ যখন 'ছেলাবেলার গল্প শোনার দিনগুলি'কে পিছনে ফেলে এসে এই বইগুলির পাতা ওলটানো হয় তখন এই বইগুলি আর শুধু আনন্দের রসদ যোগায় না। একই সঙ্গে যেন সমাজের পাঠ দেয়। আদর্শ মানুষ হওয়ার রসদ যেন খুঁজে পাওয়া যায় বইগুলির মধ্যে। তাহলে বাঙালির চরিত্রগঠন, সমাজগঠন, এমনকি জাতিগঠনেও কি এই বইগুলি ভূমিকা নিয়ে আসছে প্রকাশের সময় থেকে? একটু ভুল হল। এই আদর্শ, নীতি মানুষের জীবনে শুরু হয়েছিল বহুকাল আগে। আর আদর্শ, নীতিগুলিকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে, এক যুগ থেকে আর এক যুগে পাঠিয়ে দিতে অবলম্বন হয়েছিল গল্পের। এগুলি আমাদের স্মৃতির স্তরীভূত রূপ। মৌখিক পরম্পরায় বাহিত গল্পগুলি ব্যক্তি, জাতি, কাল, স্থান ভেদে পরিবর্তিত হয়েছে। আর গল্পের শরীরে জমা হয়েছে আমাদের ফেলে আসা ইতিহাস। সুকুমার সেন তাই যথার্থই মন্তব্য করেছেন: "মানবগোষ্ঠীর স্মৃতি জমে আছে লোকসাহিত্যের মধ্যে, ছেলে-বুড়ো ভোলানো ছড়ার ও গল্পের মধ্যে। তবে তা এমনভাবে বিকীর্ণ হয়ে আছে যে টের পাওয়া খুবই দুর্ঘট।"[৭]

বর্ণ পরিচয় গ্রন্থের সঙ্গে *ঠাকুমার ঝুলি, টুনটুনির বই* গ্রন্থ দুটির শ্রেণিগত দূরত্ব অনেকখানি। তবু বর্ণ পরিচয় গ্রন্থের দুটি ভাগের আলোচনা এখানে করা হয়েছে। তার কারণ *বর্ণ পরিচয়* শিশুকে শুধু বর্ণের সঙ্গে পরিচয় করায় না, নীতি, সামাজিক জীবনের সঙ্গেও পরিচয় ঘটায়। আর একটু বড়ো হয়ে যখন তারা *ঠাকুমার ঝুলি, টুনটুনির বই* হাতে পায় তখন পূর্বের সেই শিক্ষার প্রায়োগিক দিক তারা লক্ষ করে এই বইগুলির গল্পের আড়ালে।

(৩)

বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ-এর '১২ পাঠ' শুরু হয়েছে—

"কখনও মিছা কথা কহিও না।
কাহারও সহিত ঝগড়া করিও না।
কাহাকেও গালি দিও না।
ঘরে গিয়া উৎপাত করিও না।
রোদের সময় দৌড়াদৌড়ি করিও না।
পড়িবার সময় গোল করিও না।
সারা দিন খেলা করিও না।"[৮]

গোপাল রাখাল-এর কথা আমরা এই গ্রন্থের '১৯ পাঠ' ও '২০ পাঠ'-এ পেয়েছিলাম। *বর্ণ পরিচয়* দ্বিতীয় ভাগ-কে নীতি শিক্ষার বই বললে খুব ভুল বলা হয় না। দ্বিতীয় ভাগের '১ম থেকে ১০ম পাঠ' প্রতিটি পাঠে শিশুকে নীতিশিক্ষা দেওয়ার বিষয়টি লক্ষ করা যায়। সঙ্গে এসেছে আইনের কথা। শিশুকে আদর্শ মানুষ হয়ে ওঠার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে এখানে। প্রথম ভাগের উল্লিখিত উদ্ধৃতি যেন পুনর্লিখিত হল দ্বিতীয় ভাগের '১ম পাঠ'-এ: "কখনও কাহাকেও কুবাক্য কহিও না। কুবাক্য কহা বড় দোষ। যে কুবাক্য কহে, কেহ তাহাকে দেখিতে পারে না।"[৯] উদ্ধৃতি দিয়ে লেখার কলেবর বৃদ্ধি না করে দু-একটি পাঠের অংশ শুধু তুলে দেওয়া হল। "দেখ বালকগণ! পৃথিবীতে পিতা মাতা অপেক্ষা বড় কেহ নাই।... তাঁহারা কত যত্নে, কত কষ্টে তোমাদের লালন পালন করিয়াছেন। তাঁহারা সেরূপ যত্ন ও সেরূপ কষ্ট না করিলে, তোমাদের প্রাণরক্ষা হইত না।"[১০] যাদব, নবীন, মাধব, ভুবনের পদস্খলনের গল্প এই গ্রন্থের কয়েকটি পাঠের অংশ।

বর্ণ পরিচয় দ্বিতীয় ভাগ-এর '১০ম পাঠ'-এর শিরোনাম 'চুরি করা কদাচ উচিত নয়'। শুরুতেই কি লেখা আছে? "না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়, চুরি করা বড় দোষ। যে চুরি করে, তাহাকে চোর বলে। চোরকে কেহ বিশ্বাস করে না। চুরি করিয়া ধরা পড়িলে, চোরের দুর্গতির সীমা থাকে না। বালকগণের উচিত, কখনও চুরি না করে [করা]।"[১১] এরপর চুরির জন্য ভুবনের কি শাস্তি হয়েছিল তা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু একটা শিশুর চোর বা ডাকাতে পরিণত হওয়ার পিছনে তার মা-বাবা,

আত্মীয় পরিজনের ভূমিকাকেও অস্বীকার করা যায় না। লেখক তাই সুকৌশলে তাদেরও শিক্ষা দিলেন। সচেতন করে দিলেন তাদের কর্তব্য সম্পর্কে। "মাসী নিকটে গেলে পর, ভুবন তাঁহার কানের নিকটে মুখ লইয়া গেল এবং জোরে কামড়াইয়া, দাঁত দিয়া তাঁহার একটি কান কাটিয়া লইল। পরে ভৎর্সনা করিয়া কহিল, মাসী; তুমিই আমার এই ফাঁসির কারণ। যখন আমি প্রথম চুরি করিয়াছিলাম, তুমি জানিতে পারিয়াছিলে। সে সময়ে যদি তুমি শাসন ও নিবারণ করিতে, তাহা হইলে আমার এ দশা ঘটিত না। তাহা কর নাই, এজন্য তোমার এই পুরস্কার।"[১২]

ঠাকুমার ঝুলি-র প্রথম গল্প 'কলাবতী রাজকন্যা'। সন্তানহীন রানিদের সন্তানবতী হওয়ার লোভ, ঈর্ষার কথা আছে গল্পের প্রথমে। ন-রানি, ছোটোরানিকে (যারা ছোটো, দুর্বল, সমাজে পিছিয়ে আছে) ফাঁকি দিয়ে অন্য পাঁচ রানি সন্ন্যাসীদত্ত গাছের শিকড় খেয়ে সন্তানের জন্ম দিয়ে গর্বিত মা হতে চেয়েছিল। চেয়েছিল রাজার চোখেরমণি হতে। কিন্তু সন্ন্যাসী প্রদত্ত শিকড় নয়, শিকড় বাটা হয়েছিল যে শিলে সেই শিল ধোয়া জল খেয়ে(উপরতলার বাবুদের উচ্ছিষ্টের অনুষঙ্গ) ন-রানি ও ছোটোরানি জন্ম দিলেন পেঁচা ও বানর। যাদের কেউ দেখতে পারে না তাদের ছেলেরা তো অন্যের চোখে প্যাঁচা বা বানরই হবে তাই না? কিন্তু শেষ পর্যন্ত যারা ছিল অবহেলিত, অস্পৃশ্য তারাই পাণিগ্রহণ করতে পারল কলাবতী, হিরাবতীদের। রূপকথার গল্পে এটাই হয়। যারা এক সময় দুঃখ পায় তারাই শেষে সুখের মুখ দেখে। অবশ্য সৎ ও সত্য পথে চললে তবেই তুমি অন্ধকার রাতের শেষে নতুন সূর্যের মুখ দেখবে। সেজন্য শেষ হাসি হাসল ন-রানি ও ছোটোরানি (প্রলেতারিয়েতদের/ নিম্নবিত্তের জয়)। পরিবার, সমাজে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে, ভাগাভাগি করে সমস্ত সম্পদ ভোগ করতে হয়, সকলকে নিয়ে চলতে হয়। অন্যকে বঞ্চিত করতে নেই তার প্রাপ্য থেকে এই নীতি শিক্ষাই দেয় গল্পটি।

'সাত ভাই চম্পা' গল্পটিও এনেকখানি 'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পের শিক্ষানুসারী। তবে এখানে নীতির সঙ্গে আইনের বিষয়টিও এসেছে। রাজা শেষ পর্যন্ত মিথ্যাবাদী, হৃদয়হীন বড়ো রানিদের অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছেন: "রাজা তখনি বড়রাণীদিগে হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়া পুঁতিয়া ফেলিতে আজ্ঞা দিয়া, সাত-রাজপুত্র, পারুল-মেয়ে আর ছোটরাণীকে লইয়া রাজপুরীতে গেলেন।"[১৩]

'শীত বসন্ত' গল্পেও কাওকে ফাঁকি দিয়ে, বঞ্চিত করে সুখী হতে গেলে কী ফল হয় তা দেখানো হয়েছে। 'নীলকমল আর লালকমল' গল্পেও সতিন পুত্রকে ফাঁকি দেওয়ার বিষয়টি রয়েছে। তবে এই গল্প ভাই-এ ভাই-এ(মানুষে, মানুষে) 'বেঁধে বেঁধে' থাকারও গল্প। কাউকে বিনা স্বার্থে উপকার করলে তার থেকেও তুমি উপকার পাবে। ব্যাঙ্গমআ-ব্যাঙ্গমীর কাহিনির মধ্য দিয়ে সে দিকটিকে দেখানো হয়েছে। বিপদের সময় নিজের মাথাকে শান্ত রাখতে হয়, উপস্থিত বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হয় এই বার্তাও গল্পটি আমাদের দেয়।

'কাঁকনমালা, কাঞ্চনমালা' গল্পে 'রাজার মুখ-ময় সূঁচ, গা-ময় সূঁচ,—মাথার চুল পর্যন্ত সূঁচ' কি শুধুই রূপকথা? এর মধ্যে কি কোনো সত্যতা লুকিয়ে নেই? গরিব, রাখালকে একদিন মন্ত্রী করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সে সময়কার রাজপুত্র। আজ যিনি দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কাঞ্চনমালা রানিও তার জুটেছে। ফলে 'বিলাসের জলে' ভেসে দুখি বন্ধুর কথা বিস্মৃত হওয়াই স্বাভাবিক। এমনকী রাখাল রাজার সঙ্গে দেখা করতে এলে দুয়ারিরা তাকে 'দূর, দূর' করে তাড়িয়ে দেয়। রাখালের প্রতি করা অন্যায় বিবেকের তাড়না হয়ে ফিরে আসে। সূঁচ আসলে রাজার বিবেকের দংশন। রাখালকে মন্ত্রী করে তবে রাজা মুক্তি পায় তার যন্ত্রণা থেকে। এই গল্প আমদের শেখায় কাউকে কথা দিলে তা রক্ষার চেষ্টা করতে হয়।

ঠাকুমার ঝুলি গ্রন্থে নীতিশিক্ষার সবথেকে বেশি প্রকাশ ঘটেছে যে গল্পে সেটি হল—'সুখু আর দুখু'। সুখুর মা ও সুখু চিরদিন চেয়েছে সুখে, স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে। এজন্য দুখুর মা ও দুখুকে ফাঁকি দিতেও তাদের বিবেকে বাধেনি। কিন্তু সৎ পথে থাকলে, নির্লোভী হলে, অল্পে সুখী হলে কষ্ট আসে না জীবনে। বেশি লোভ করলে, মানুষকে সম্মান না দিলে তুমি যতই সম্পদের অধিকারী হও না কেন তুমি সুখী হবে না, কষ্টে দিন কাটাবে। এই জীবনদীক্ষা দেয় গল্পটি।

'শিয়াল পণ্ডিত' গল্পে অতি চালাকি করে সকলকে ঠকাতে গেলে কী ফল হয় সেটি দেখানো হয়েছে।

টুনটুনির বই-এর নিবেদন অংশে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখছেন: "সন্ধ্যার সময় শিশুরা যখন আহার না করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িতে চায়, তখন পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলের স্নেহরূপিণী মহিলাগণ এই গল্পগুলি বলিয়া তাহাদের জাগাইয়া রাখেন। সেই গল্পের স্বাদ শিশুরা বড় হইয়াও ভুলিতে পারে না।"[১৪] শুধু গল্প নয়, গল্পের মধ্যেকার শিক্ষাও তাদের মনের মধ্যে এমনভাবে গেঁথে যায় যে সেগুলি ভোলা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

টুনটুনির বই-এর প্রথম গল্প 'টুনটুনি আর বিড়ালের কথা'। অন্যের তুলনায় বলশালী নিজের আখের গোছাতে দুর্বলের উপর অত্যাচার করতে চাইলে তাদের কীরকম শাস্তি হতে পারে তার শিক্ষা দেয় এই গল্প। 'চোরের শত দিন গৃহস্থের এক দিন' এই প্রবাদের প্রত্যক্ষরূপ যেন লক্ষ করা যায় 'পান্তাবুড়ির কথা' গল্পে। চুরি বিদ্যা থেকে শিশুদের দূরে রাখার বার্তা দেয় এ গল্প। 'দুষ্ট বাঘ'-এর গল্পের কথা নিশ্চয় সকলের মনে আছে। চালাকির আশ্রয় নিয়ে মানুষকে ঠকানো উচিত নয় সে কথাই না বলে গল্পটি?

নীতি ও আইনের যোগসূত্রের কথা আগে বলা হয়েছে। 'সাক্ষী শিয়াল' গল্পটি পড়লে এই বিষয়টি খুব ভালো বোঝা যায়। সওদাগরের ঘোড়াকে নিজের ঘোড়া বলে দাবি করে চোর। বুদ্ধি ও বাকচাতুর্যকে কাজে লাগিয়ে মিথ্যাকে সত্য প্রমাণও করে দেয়। কিন্তু শেষরক্ষা হয় না। শিয়ালের বুদ্ধিতে সত্যের জয় হয়। রাজা শাস্তি দেয় চোরকে। পাশের বাড়ির ভিটের পরিধি ক্রমশ বেড়ে যায়। আর সংকীর্ণ হয়ে আসে আপনার বাসস্থানের সীমা। বাচস্পতি, উপেনদের জমি অজান্তে ভক্তপ্রসাদের মতো জমিদারের হয়ে যায়।[১৫] 'শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল'ও জুটে যায়। অসত্যকে সত্য বলে চালানো হয়। রাজনীতির দাদারা সেখানে ঘোলা জলে মাছ ধরেন। পুলিশের বউ-এর নতুন গয়না বাড়ে। আদালতে যেতে যেতে একসময় আপনি আশা ছেড়ে হতাশ হয়ে ভাগ্যের দোহায় দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন। তবুও আমরা 'আশা নিয়ে ঘর করি, আশায় পকেট ভরি'। ভাবি 'মিথ্যা যতোই প্রবলপ্রতাপী হোক, তবু সে ভঙ্গুর, অবশেষে সত্য জয়ী হয়'। 'জীবনে সত্যের জয় অবশ্য, নিশ্চিত'।[১৬] এই গল্পের শেষে সেটিকেই লেখক প্রতিষ্ঠা দিলেন।

(৪)

টুনটুনির বই ও *ঠাকুমার ঝুলি* গ্রন্থ দুটি সম্পর্কে এখানে দু-চার কথা আলাদা করে বলা প্রয়োজন। এই দুটি গ্রন্থ যেহেতু গল্পকথা, রূপকথা জাতীয় সেজন্য কল্পনার প্রাধান্য রয়েছে। অধিকাংশ সময়ে তা বিশ্বাসের সীমা ছাড়িয়েছে। আমাদের মতো বিজ্ঞানচেতনা সম্পন্ন মানুষের কাছে এগুলি অবিশ্বাস্য, উদ্ভট বলে মনে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এগুলি শিশুর মনের মাপে গড়া। এইসমস্ত রচনা সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলা একটি কথা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে: "শিশুচিত্তের উপরে ইহার অনুপম প্রভাব বুঝিতে হইলে আগে শিশুর মনোজগতের কতকটা পরিচয় থাকা চাই। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি—যাঁহার মনে সম্ভব অসম্ভবের মধ্যে সীমারেখা সুস্পষ্টভাবে টানা হইয়া গিয়াছে, যিনি সংসারে প্রাপ্য-অপ্রাপ্যের মধ্যে ভেদ করিতে শিখিয়াছেন, যাঁহার নিকট পৃথিবী আপনার সম্পূর্ণ রহস্যভাণ্ডার নিঃশেষে উজাড় করিয়া দিয়াছে,—তাঁহার[রা] ইহার মধ্যে প্রকৃত রসের সন্ধান না পাইবারই কথা।"[১৭] কিন্তু এরমধ্যে রয়েছে অন্যতর বাস্তবতা। 'magic realism' বা জাদুবাস্তবতা দিয়ে যাকে অনেকে ব্যাখ্যা করতে পারেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে বাস্তবে যে স্বাদ আমাদের পূর্ণ হয় না স্বপ্নে আমরা তাকে পূরণ করার চেষ্টা করি। রূপকথা, উপকথা আমদের সেই স্বপ্ন পূরণের গল্প।

মা-বাবাও তাদের সন্তানদের নিয়ে স্বপ্ন দেখেন। চান তাদের ছেলে মেয়ে মানুষের মতো মানুষ হোক। দশের মধ্যে এক হোক। পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করুক। মুখে সমাজ, জীবন, আদর্শ মানুষ হওয়ার পাঠ দিলে একটা শিশু যতখানি গ্রহণ করে তার থেকে ঢের উপকৃত হয় নিজেরা পড়ে। কারণ এগুলি যে তাদের আগ্রহের বই, ভালোলাগার সঙ্গী। চেতনে, অবচেতনে শিশু-কিশোরদের মনে গেঁথে যায় বইগুলির শিক্ষা। বড়ো হয়েও যা তারা ভুলতে পারে

না। তাই একসময় "বড় গাছ।/ ভাল জল।/ লাল ফুল।/ ছোট পাতা"[১৮]-র সঙ্গে পরিচয় হতে হতে শিশুর মন নীলকমল লালকমল-দের মতো ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর পিঠে চেপে পাড়ি দেয় পরবর্তী সাফল্যের বৃহৎলোকে। আর সে লোকে তার পূর্বের অভিজ্ঞতা তাকে সাহস যোগায়, পথ চিনিয়ে দেয় ক্ষীর সাগরের হাজার ঢেউকে জয় করে দুধের বরণ হাতীর মাথার গজমোতিকে জয় করে আনার।

উৎস নির্দেশ ও প্রাসঙ্গিক তথ্য:

১) শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের *গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাস* গ্রন্থটির অংশ বিশেষ লেখকের পড়া থাকার কারণে গ্রন্থটির ভাবনা এই অংশের ভাবনাকে প্রভাবিত করতে পারে

২) হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ* দ্বিতীয় খণ্ড, নবম মুদ্রণ, নিউ দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৬, পৃ. ১৯২১

৩) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা রচিত। প্রথম প্রকাশ: ১৮৫৫ খ্রি.; ১লা বৈশাখ, সংবৎ ১৯১২

৪) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা রচিত। প্রথম প্রকাশ: ১৮৫৫ খ্রি.; ১লা আষাঢ়, সংবৎ ১৯১২

৫) সংকলক: শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। প্রথম প্রকাশ: ভাদ্র ১৩১৪; ইংরেজি ১৯০৭

৬) উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী রচিত। প্রথম প্রকাশ: ১৩১৭ বঙ্গাব্দ, ইংরেজি ১৯১০

৭) সুকুমার সেন, "গল্পের গাঁটছড়া", দ্র. অলোক রায়, পবিত্র সরকার, অভ্র ঘোষ (সম্পাদিত), *দুশ বছরের বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য*, প্রথম সংস্করণ, নিউ দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৭, পৃ. ২৮৩

৮) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা, *বর্ণ পরিচয়* প্রথম ভাগ, *বিদ্যাসাগর রচনাবলী* ১, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, সাহিত্যম, এপ্রিল ২০০৬, বৈশাখ ১৪১৩, পৃ. ৫২৮

৯) ঐ, *বর্ণ পরিচয়* দ্বিতীয় ভাগ, *বিদ্যাসাগর রচনাবলী* ১, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩৪

১০) ঐ, পৃ. ৫৪২

১১) ঐ, পৃ. ৫৪৪

১২) তদেব

১৩) শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (সংকলিত), *ঠাকুমার ঝুলি*, সপ্তচত্বারিংশৎ সংস্করণ, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪১৫, পৃ. ৭৩

১৪) উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, *উপেন্দ্রকিশোর রচনাবলী*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, সাহিত্যম, ২০০০, পৃ. ৯

১৫) বাচস্পতি মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-৭৩) *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ* (১৮৬০) প্রহসনের চরিত্র। উপেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) *চিত্রা* (১৮৯৬) কাব্যের "দুই বিঘা জমি" কবিতার চরিত্র

১৬) শম্ভু মিত্র, *চাঁদ বণিকের পালা*, ত্রয়োদশ সংস্করণ, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১৫

১৭) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, "রূপকথা", *একালের সমালোচনা সঞ্চয়ন*, পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, জুলাই ২০১০, পৃ. ৪৫

১৮) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা, *বর্ণ পরিচয়* প্রথম ভাগ, ঐ, পৃ. ৫২৭।

"Dream is not that you see in sleep, dream is something that does not let you sleep."

—*A.P.J. Abdul Kalam*

"যে ব্যক্তি শ্রমবিমুখ হইয়া আলস্যে কালক্ষেপ করে তাহার চিরকাল দুঃখ ও চিরকাল অভাব থাকে।"

—*ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর*

২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে আমাদের সাফল্যের কিছু খতিয়ান

১। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ অনুযায়ী ৩ ও ৪ বছরের মেজর ও মাইনর শিক্ষাক্রম চালু হয়েছে।

২। কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে সিট বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৩। শারীর শিক্ষা বিভাগে ৪ বছরের মেজর কোর্স চালু হয়েছে।

৪। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে কলেজকে 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের সফল রূপায়ণের জন্য হুগলি জেলার মধ্যে দ্বিতীয় পুরস্কারে পুরস্কৃত করেছে।

৫। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত অ্যাথলেটিক মিটে হুগলি জেলার মধ্যে মহিলা বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে কলেজ।

৬। কলেজের ওয়েব সাইটকে আরো আধুনিকিকরণ করা হয়েছে।

৭। হুগলি জেলা পরিষদের অর্থানুকূল্যে শিক্ষার্থীদের জন্য 'মর্ডান টয়লেট' নির্মিত হয়েছে।

৮। হুগলি জেলা পরিষদের অর্থানুকূল্যে পরিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য জলসত্র নির্মিত হচ্ছে।

৯। জলসংকট থেকে মুক্তির লক্ষ্যে হুগলি জেলা পরিষদের অর্থানুকূল্যে কলেজে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১০। কলেজ ক্যাম্পাসে ভারত সরকারের অর্থানুকূল্যে 'রেইন গেজ স্টেশান' নির্মিত হয়েছে।

১১। অ-পুনর্নবীকরণ শক্তির ব্যবহার কমাতে সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পকে আরও প্রসারিত করা হয়েছে।

১২। জৈব সার তৈরির প্রকল্প নির্মিত হয়েছে।

১৩। কলেজের গ্রিন ও অ্যাকাডেমিক অডিট করানো হয়েছে।

১৪। কলেজ ক্যান্টিনের সংস্কার সাধিত হয়েছে।

১৫। রুশা বিল্ডিং-এর ৩ তলা নির্মাণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ উচ্চশিক্ষা দপ্তর অর্থ অনুমোদন করেছে।

১৬। কলেজের শ্রীবৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন জমি ক্রয় করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

১। কিছু কিছু বিভাগে, বিশেষ করে বিজ্ঞান বিভাগগুলিতে ৪ বছরের মেজর কোর্স চালু করা।

২। কলেজের বিজ্ঞান বিভাগগুলির পরিকাঠামো বৃদ্ধি। অন্যান্য বিভাগগুলির আরো শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো।

৩। কলেজের সুরক্ষা বৃদ্ধির জন্য চারিদিকে প্রাচীরের ব্যবস্থা করা।

৪। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বায়োমেট্রিকের ব্যবস্থা করা।

৫। অসমাপ্ত স্পোর্টস কমপ্লেক্সকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া।

৬। একটি উন্নত মানের অডিটোরিয়াম তৈরি করা।

৭। কলেজে শিক্ষার পরিবেশককে আরো উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া।

কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্যদের তালিকা:

Sl.	Name	Post
1	Shri Shrima Dandi Swami Sureshwar Ashram	Member G.B.
2	Shri Ramendu Sinha Roy	President G.B.
3	Dr. Arundhati Moulik (Ray)	TIC & Ex-Officio Secretary G.B.
4	Dr. Tanmay Ghosh	Member G.B.
5	Dr. Sounabha Chinya	Member G.B.
6	Dr. Kalkali Sharma	Member G.B.
7	Dr. Ramanuj Konar	Member G.B.
8	Dr. Pintu Shee	Member G.B.
9	Dr. Mahuya Biswas	Member G.B.
10	Shri Khokan Halder	Member G.B.

ক্লাস টেস্ট

ছবি: (১) হুগলি জেলায় অ্যাথলেটিক মিটে দ্বিতীয় পুরস্কার অর্জন।
(২) জলসত্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে। (৩) জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তর

শংসাপত্র

২০২৪

কন্যাদের সার্বিক বিকাশ ও ক্ষমতায়নের দিশারী **কন্যাশ্রী** প্রকল্পের আলোয় সমাজ আজ উদ্ভাসিত ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে এই লক্ষ্য পূরণ ও কন্যাশ্রী প্রকল্পের সফল রূপায়ণের নিরিখে **তারকেশ্বর ডিগ্রী কলেজ** কে **হুগলী** জেলার প্রথম /দ্বিতীয় /তৃতীয় স্থানাধিকারী মহাবিদ্যালয় হিসেবে ১৪ ই অগাস্ট ২০২৪ তারিখে **একাদশতম কন্যাশ্রী দিবস** উদযাপন উপলক্ষে **হুগলী** জেলার পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেওয়া হলো ।

জেলা শাসক
হুগলী